Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবি সাহিত্যের যুগবিভাগ ও যুগধর্ম

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v50i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.9
Pages	১৯১-২১৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আরবি সাহিত্যের যুগবিভাগ ও যুগধর্ম

Check for updates

মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী*

সাহিত্য হচ্ছে সমাজদর্পণ। সমাজের সংস্কৃতি, লোকাচার ও লোকমানসের প্রতিফলন ঘটে সমকালীন সাহিত্যিকদের সাহিত্যসম্ভারে। আবার যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই সাহিত্যে কালিক ঝোঁক ও যুগধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধেয় বিষয়। যুগবিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত হয় তেমনি বিষয়বস্তুতেও আমূল বৈচিত্র্য সাধিত হয়। কোনো ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুগে যুগে নানা স্তরে ঐ ভাষা ও সাহিত্যের উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, গতিশীলতা ও স্থবিরতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং উক্ত সাহিত্যের প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সাহিত্যাঙ্গনে এর বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক প্রভাব নিরূপণ করা। সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার, এর উন্মেষ-বিকাশের নেপথ্য কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সাহিত্যসাধকের মানস ও রুচিবৈচিত্র্য অনুধাবনে 'সাহিত্যের ইতিহাস' জানার উপযোগিতা অনেক। প্রত্যেক যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের উপর সামসময়িক যুগপ্রবণতার ছাপ উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া সাহিত্যকে কালিক ব্যবধানে শ্রেণিবিভাজন দ্বারা সাহিত্যের বিষয়-পরিধি সামান্যীকরণ ও সাহিত্য-পাঠ সহজীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

প্রতিটি জাতির সাহিত্যের ইতিহাস উক্ত জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বরং বলা যায়, একটি অপরটির শক্তিশালী প্রভাবক, অনুঘটক ও উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। অবশ্য সাহিত্যের উপর ভূখণ্ড ও অঞ্চলগত প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। তবে সাহিত্যিক পট পরিবর্তনে রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতিই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে ইতিহাসবেত্তাগণ রাজনৈতিক যুগান্তরের উপর নির্ভরশীল হয়ে সাহিত্যের যুগবিভাজন করেছেন। আবার কোন কোন সাহিত্যবিশ্লেষক একই যুগের সাহিত্যকর্মের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন, প্রকাশভঙ্গির প্রাচুর্য ও সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের অনুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনার লক্ষ্যে ঐ যুগকে নানা উপভাগে বিভক্ত করেছেন। সাহিত্যের যুগমানস ও যুগধর্মকে সামনে রেখে আমরা আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রথমত ছয়টি যুগে বিভাজন করে পরবর্তীকালে প্রায় প্রত্যেকটিকে আবার একাধিক উপভাগে ভাগ করার প্রয়াস পাব। আরবি সাহিত্যের প্রধান ছয়টি যুগ হচ্ছে :

১. জাহিলি যুগ (৪৫০-৬২২ খ্রি.);
২. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রি./০১-৪০ হি.);
৩. উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি./৪০-১৩২ হি.);
৪. আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি./১৩২-৬৫৬ হি.);
৫. পতন যুগ (১২৫৮-১৭৯৮ খ্রি./৬৫৬-১২১৩ হি.);
৬. আধুনিক যুগ (১৭৯৮ খ্রি./১২১৩ হি.-বর্তমান)।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. জাহিলি যুগ (৪৫০-৬২২ খ্রি.)

আল-জাহিয (মৃ. ৮৬৯ খ্রি./২৫৫ হি.), মোস্তফা সাদিক আর-রাফি'ঈ (মৃ. ১৯৩৭ খ্রি.), আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত (মৃ. ১৯৬৮ খ্রি.), প্রাচ্যবিদ নিকলসন (মৃ.১৯৪৫ খ্রি.), ড. শাওকি দ্বায়ফ (মৃ. ২০০৫ খ্রি.) প্রমুখ সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিক জাহিলি যুগের সময়সীমা কিছু কমবেশি দেড়শত হতে দুই শত বৎসর নির্ধারণ করেছেন (আল-জাহিয, ১৯৬৯ : ১ : ৭৪; মোস্তফা, ২০০৩ : ৩ : ১৪; আহমাদ, ২০০০ : ৮; Nicholson, ১৯৬৬ : ৭১; শাওকি, তা. বি. : ৩৮-৩৯)। অর্থাৎ আনু. ৪৫০ খ্রি. হতে ইসলামের অভ্যুদয়কাল তথা ৬২২ খ্রি. পর্যন্ত জাহিলি যুগের পরিধি ব্যাপ্ত। তবে পরিমাণগত ও মানগত ব্যবধানের নিরিখে জাহিলি সাহিত্যকে আমরা দুই পর্বে বিভক্ত করতে পারি। এক. আদিপর্ব; দুই. অন্ত্যপর্ব। আদিপর্বে খণ্ড কবিতার (মুকাত্তা'আ) সন্ধান পাওয়া যায় আর অন্ত্যপর্বে দীর্ঘ কবিতা তথা কাসিদার রূপ পাওয়া যায়। আদিপর্বে প্রাচীন কবিদের উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বতোৎসারিত গুটি কয়েক পঙ্‌ক্তি ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল না (ইব্‌ন কুতায়বা, ১৯৬৬ : ১ : ১০৪)। এই স্তরের কবিদের মধ্যে দুওয়ায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন নাহ্‌দ, 'আনবার ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন তামীম, আ'সুর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স 'আয়লান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম নেয়া যায়। এসব কবির সৃষ্টিসম্ভার পরিমাণগতভাবে যেমন নিতান্ত অপ্রতুল তেমনি এর সাহিত্যমানও অত্যন্ত নিম্নমার্গীয়। অন্ত্যপর্বের উজ্জ্বলতম নিদর্শন হচ্ছে *'আস্‌-সাব'উল মু'আল্লাকাত'* বা 'ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক'। জাহিলি যুগের এই কাব্যগুচ্ছ কেবল আরবি সাহিত্যের নয় বরং বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সাহিত্যিক মানে এর উৎকৃষ্টতা যুগে যুগে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ইউরোপসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় এ কাব্য অনূদিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে, মু'আল্লাকার সংখ্যা সাত এবং এর রচয়িতাগণ হচ্ছেন ইমরু'উল কায়স (মৃ. আনু. ৫৪৫ খ্রি.), তারাফা (মৃ. আনু. ৫৬৪ খ্রি.), যুহায়র (মৃ. আনু. ৬১০ খ্রি.), লাবিদ (মৃ. আনু. ৬৬১ খ্রি.), 'আমর ইব্‌ন কুলছূম (মৃ. আনু. ৬০০ খ্রি.), 'আনতারা (মৃ. আনু. ৬১৫ খ্রি.) ও হারিছ ইব্‌ন হিল্লিযা (মৃ.আনু. ৫৭০ খ্রি.)। সার্বিক বিবেচনায় ৫ম শতাব্দীকে আমরা জাহিলি যুগের আদিপর্ব এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী ইসলামের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবশিষ্ট সময়কে জাহিলি যুগের অন্ত্যপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। মূলত অন্ত্যপর্বেই জাহিলি সাহিত্য পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যচর্চা কাব্য দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল, আরবি ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। কবিতাই প্রাচীন আরবদের আত্মার খোরাক। জাহিলি যুগের সাহিত্য বলতে প্রধানত কাব্য সাহিত্যকেই বুঝায়। সাহিত্যের অপর শাখা গদ্য সেখানে নিতান্তই অপ্রতুল। জাহিলি কাব্যসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের সামনে গদ্যসাহিত্যকে অস্তিত্বহীন মনে হবে। এতৎসত্ত্বেও প্রাচীন আরবি সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বেশ কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতিবাক্য, প্রবাদ-প্রবচন, যাদুকর ও জ্যোতিষীদের অন্ত্যমিলযুক্ত শ্লোক ও বাগ্মীদের কতিপয় অভিভাষণ জাহিলি গদ্যের সরব অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। তবে কাব্যই জাহিলি যুগের প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্য শাখা।

আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে জাহিলি কাব্যের ভাষা অদ্যাবধি বিশুদ্ধ ও অলংকারমণ্ডিত রচনাশৈলীর উত্তম নমুনা হয়ে টিকে আছে। অনারবের সংমিশ্রণ হতে দূরে অবস্থান,

বাহুল্যবর্জিত অকৃত্রিম প্রকাশ ও অলংকার প্রয়োগে অনাড়ম্বরতা বেদুঈন কবির ভাষাকে অনুকরণীয় ও আদর্শ ভাষার স্তরে উন্নীত করেছে। জাহিলি কবিগণ বেদুঈন জাতি হিসেবে স্বভাবজাতভাবেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কোন পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁরা এগোন নি; ফলে তাঁদের কবিতা স্পষ্টবাদিতা, অকৃত্রিমতা, দ্ব্যর্থহীনতা, বিশুদ্ধ ছন্দ প্রয়োগ ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত (আহমদ, তা. বি. : ৫১)। তাঁদের কাব্যে দেখা যায়, বিষয়বস্তুর সাথে শব্দ বা ভাষার একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কবি যখন মরুর পরিবেশ ও এর দৃশ্যাবলির বর্ণনা দেন তখন তাঁর কবিতায় মরূপযোগী অপরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। মরুর রুদ্রতা ও মরু জীবনের রুক্ষতার বর্ণনায় কবি ওজস্বী শব্দাবলি গ্রহণ করতেন। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন ও গৌরব প্রকাশে তদনুরূপ তেজোদ্দীপ্ত ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। অপরদিকে প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও শোকের মতো আবেগিক বিষয় ও অর্থ প্রকাশে সহজ সাবলীল ও সুমিষ্ট ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হয় (য়াহ্য়া, ২০০১ : ২৭৫)। জাহিলি কাব্যের রচনাশৈলীতে সংক্ষেপণের ('ঈজায) আধিপত্য সর্বত্র বিরাজমান। কেননা আরবরা কোন বিষয়ে বাগাড়ম্বরতা, দীর্ঘসূত্রিতা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণকে অপছন্দ করত। তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সুবাদে সামান্য ইঙ্গিতেই তারা কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হত। উপরন্তু তাদের মধ্যে সভ্যতা, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান বা তদনুরূপ কোন জ্ঞানের পরশ লাগে নি, যা তাদের কোন বিষয়ের গভীরে যাওয়ার বা দীর্ঘতর বিশ্লেষণের প্রতি তাড়া করত। এসব কারণে তাদের অন্তরে উদিত বিষয়কে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

অনুভূতিপ্রবণতা ও অর্থগত অনুকৃতি সমগ্র জাহিলি কবিতায় সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। অনুভূতিপ্রবণতার কারণেই দেখা যায়, কবি যখন কোন বস্তুর চিত্রাঙ্কন করেন তখন তার সমগ্র অংশে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা পেশ করেন। এর দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে, উক্ত বস্তুর বাস্তব ও সঠিক চিত্র কাব্যে তুলে ধরা। স্বীয় অনুভূতির প্রতি আনুগত্যশীলতার কারণেই জাহিলি কাব্যের অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় নি এবং কতিপয় সীমাবদ্ধ অর্থের মধ্যে এর পরিধি আবর্তিত ছিল। ফলে দেখা যায়, তারাফা উষ্ট্রী সম্পর্কে যা বলেছেন অন্য কবিগণও এর চর্বিতচর্বণ করেছেন। ইমরু'উল কায়স যেমন প্রিয়ার বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আক্ষেপ ও অশ্রুবিসর্জনের মাধ্যমে কাসিদার সূচনা করেছেন, তেমনি অন্য কবিগণও তদনুরূপভাবে নিজ নিজ কাব্যে এর অনুসরণ করেছেন। মূলত জাহিলি কাব্যের উপজীব্য বিষয় সমকালীন বেদুঈন জনগোষ্ঠী ও তৎকালীন পরিবেশানুগ নির্দিষ্ট কিছু পরিমণ্ডলে পরিবৃত ছিল। কেননা প্রকৃতিই ছিল মূলত জাহিলি আরবদের শিক্ষালয়; ফলে প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই সমকালীন কবিদের কাব্য-বিষয় আবর্তিত। অবশ্য অর্থগতভাবে সকল কবির কাব্যে সাদৃশ্যগত মিল পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকের অভিব্যক্তিতে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক কবিই চেষ্টা করেছেন ভাবের অভিব্যক্তিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পের ছাপ যেন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় (মুকতাদা, ১৯৮৫ : ১ : ১৬০)। তাঁদের জীবন যেমন ঘূর্ণায়মান ও গতিশীল, তেমনি কাব্যার্থ প্রকাশেও তাঁরা গতিশীলতা দান করে একে জীবন্তরূপে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এজন্যই কবি যখন কোন উষ্ট্রী কিংবা অশ্বের বর্ণনা দেন তখন

তিনি গতিহীন দণ্ডায়মান কোন প্রাণীর বর্ণনা দেন না। বরং মরুভূমির সুদূর পথে চলমান গতিশীল অশ্ব কিংবা উষ্ট্রীকেই উপস্থাপন করে থাকেন (শাওকি, তা. বি. : ২২৩)।

আসলে আরবি কাব্যের জন্ম ও লালন ঘটেছে মূলত মরুভূমিতেই। সুতরাং এটি যাযাবর বেদুঈনদের ভ্রমণ ও প্রস্থানের সাহিত্য, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের সাহিত্য; এটি এমন এক গোষ্ঠীর সাহিত্য যাদের বিবেকের চেয়ে হৃদয় অধিক তাড়া করে। হৃদয়ে যা উদিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে তাই প্রকাশ করে। যার কারণে কোন একটি কাসিদার অর্থ প্রকাশে তাদের মধ্যে চিন্তার ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। একই কাসিদায় কোন ভূমিকা ছাড়া হঠাৎ করে এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায় (ত্বাহা, ১৯৮৫ : ৮৮)। বেদুঈন কবিদের কাব্যপঙ্‌ক্তিসমূহ তাঁদের খণ্ডিত চিন্তা ও বিক্ষিপ্ত কল্পনাকে প্রতিবিম্বিত করে। কবিতার একটি পঙ্‌ক্তির সাথে পূর্বাপরের অন্য পঙ্‌ক্তির খুব একটা সংযুক্তি বা সংশ্লিষ্টতা চোখে পড়ে না। প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই যেন পৃথক পৃথক অর্থে স্বাধীন। পঙ্‌ক্তিভিত্তিক এই স্বাধীনতা কাসিদার অনেক স্থানে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়েছে। কেননা কাব্য মধ্যস্থিত কোন শ্লোক কোন কারণে বিলুপ্ত হয়ে পড়লে বা স্থানচ্যুত হলে তা সহজে অনুভব করা যায় না (বুতরুস, ১৯৮৯ : ৪৫)।

গোত্রের প্রতি জাহিলি আরবের নিষ্ঠা এতই একান্ত ছিল যে, ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় সকল কাজে গোত্রের সামষ্টিক সিদ্ধান্তে তার অকুণ্ঠ সমর্থন থাকত। গোত্র ভুল পথে পরিচালিত হলেও এর অন্ধ অনুকরণ ব্যতিরেকে কোন সদস্যের গত্যন্তর ছিল না। এমনকি গোত্রের নেতাও গোত্রীয় পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাইরে পদক্ষেপ রাখার কল্পনা করতে পারত না। গোত্রশক্তি ও গোত্রীয় মর্যাদা নিয়ে বেদুঈন আরব এত বেশি আত্মবিশ্বাসী যে, সে এর সামনে দুনিয়ার তাবৎ শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করত। গোত্র-বহির্ভূত সবকিছুই তার কাছে বিজাতীয় ও অপাঙ্‌ক্তেয়। গোত্রের সাথে তার দেহ-মন এমনই একাকার হয়ে যায় যে, সে ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য ও নিজ গুণাবলিকেও গোত্রীয় মান মর্যাদার প্রতীক মনে করত। একজন কবি গোত্রের মানমর্যাদা সুরক্ষার ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করতেন; ভিন্ন গোত্রের কেউ হিজা বা নিন্দাবাদ করলে তার সমুচিত জবাব দিতেন। জাহিলি যুগে একজন কবিই তাদের মহৎ কীর্তির সংরক্ষক ও সমুদয় তথ্যের বাহক। আধুনিক যুগের জাতীয় সংবাদ পত্রের ন্যায় তখনকার গোত্রকবি ছিল গোত্রের উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনার সার্থক মুখপাত্র। এ জন্য জাহিলি কাব্যসমগ্র আরবদের তথ্যভাণ্ডার (দীওয়ানুল 'আরব) ও সঠিক যুগচিত্র বটে (আল-জাহিয, ১৯৬৯ : ১ : ৭২)। ইতিহাস গবেষকদের জন্য জাহিলি কবিতা তৎকালীন ইতিহাস রচনায় অমূল্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে এই কবিতা সাহিত্যের চেয়েও ঐতিহাসিক বিচারে অধিক মূল্যের দাবিদার। কেননা জাহিলি আরবের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ঘটনা রয়েছে যা এই কবিতা না হলে অনুদ্ঘাটিত থেকে যেত (জাওয়াদ: ১৯৭৮ : ৯ : ৭১-৭২)।

জাহিলি কাব্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সহজ-সরল ও অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। কবিগণ স্বীয় অনুভূতির কথাই ব্যক্ত করুক আর পরিবেশ প্রকৃতির চিত্রায়ণ যাই করুক না কেন বস্তুর উপলব্ধিটাই তাঁরা প্রকাশ করতে প্রয়াসী হতেন। এতে কল্পনার আশ্রয়

বা বাগাড়ম্বরের প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করতেন না। কবি তাঁর শৈল্পিক চেতনাকে বস্তু বা স্বীয় উপলব্ধির উপর চাপিয়ে দিতেন না; বরং তাঁর উপলব্ধিজাত বাহ্যিক ও বাস্তব আকৃতিকে কোন সংস্কার পরিমার্জন ছাড়া অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে হুবহু তুলে ধরতেন। আর এজন্যই তাঁদের কাব্যসম্ভার তৎকালীন মানুষের জীবন, সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা মরু, বালি, উপত্যকা, পশুপাখি, চারণভূমি ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য তথ্যচিত্র তুলে ধরে। বিষয়টি প্রাচীন লেখক ও ঐতিহাসিকগণ উপলব্ধি করেছেন বিধায় যখনই তাঁরা জাহিলি যুগের মানুষের স্বভাব ও জীবনাচারের বর্ণনা দিয়েছেন তখনই প্রামাণ্য তথ্যসূত্র হিসেবে বেদুঈন কবিদের কবিতার অবতারণা করেছেন। বস্তুত জাহিলি কবিতা তৎকালীন সমাজ প্রতিবেশের সার্থক প্রতিনিধি। সাদামাটা বেদুঈনের সহজ-সরল ভাব এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশকে কবিগণ স্বীয় উপলব্ধিজাত ভাষায় ব্যক্ত করে একে আমাদের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। তাঁদের জীবন যেমন অনাড়ম্বর তেমনি তাঁদের কাব্যের ভাব ও ভাষাও প্রলেপবিহীন ও অকৃত্রিম। ফলে জাহিলি কাব্যসম্ভারকে সমকালীন আরবের সঠিক যুগচিত্রই বলতে হবে, যেখানে যুগধর্মের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

২. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রি./০১-৪০ হি.)

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের সীমারেখা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতকাল থেকে শুরু হয়ে ৪র্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর শাসনকালের সমাপ্তি পর্যন্ত। অর্থাৎ ৬২২ খ্রি. হতে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত সুবিস্তৃত। এ যুগের কাল পরিধি অত্যন্ত সীমিত, অর্ধ শতাব্দীরও কম। ইসলাম নিছক একটি ধর্মই নয়; ইসলামের আবির্ভাব যুগপৎভাবে একটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে সমকালীন সাহিত্যেও। সুতরাং বিষয়গতভাবে জাহিলি সাহিত্যের সাথে এর আমূল পার্থক্য সূচিত হয়। জাহিলি কাব্যে যেখানে গোত্রীয় অহমিকা, বংশগৌরব, বেপরোয়া জীবন ও প্রতিশোধস্পৃহার বর্ণনা রয়েছে সেখানে ইসলামি যুগের সাহিত্যে আল্লাহ, তাওহীদ, রিসালাত ও জিহাদের প্রসঙ্গ স্থান করে নিয়েছে। ইসলাম এসে গোত্রীয় আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনে খোদাভীতিকেই মর্যাদার মানদণ্ড নিরূপণ করে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (স.) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "পিতৃপুরুষ নিয়ে জাহিলি ধারার গৌরব ও অহংকার মহান আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তিরোহিত করেছেন। তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। তাকওয়া ব্যতীত আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"(রাবী' ১৪১৫ হি. : ১ : ১৭০) ইসলামের আবির্ভাবে গোত্রীয় ও স্বাজাত্যবোধের চেতনা ধুলায় মিশে যায়। কুলজি-বন্ধন ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বের স্থলে ধর্মীয় বন্ধন ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর আদর্শিক এই পরিবর্তনের হাওয়া আরবদের চিন্তা, মনন ও সাহিত্যমানসেও দোলা দিল। সুতরাং এদ্দিন যে কবি বংশগৌরব ও নিন্দাকাব্য রচনায় নিমগ্ন ছিলেন, যে বাগ্মী স্বীয় রসনা দিয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন ছড়াতেন এবং যে অশ্বারোহী বীর দিবারাত্রি রক্তের হোলিখেলা ও শৌর্যবীর্য প্রকাশে মত্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই ইসলামের দাওয়াতে নীরব ও স্থবির হয়ে পড়লেন। তাঁরা যে কোনো কথা ও কর্মে আল্লাহর

নির্দেশ ও রাসুলের অনুমোদনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ থাকতেন। ফলে এ পর্যায়ে সাহিত্যের পরিধি ও এর চর্চা অনেকটা সীমিত হয়ে আসে (আহমাদ, ২০০০ : ৬৪-৬৫)। তবে সাহিত্যের অঙ্গনে ইসলামের এই প্রভাব শুরুতে সর্বব্যাপী ছিল না। এটি কেবল আনসার-মুহাজিরদের মধ্যে যাঁরা মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অন্যথায় যাঁরা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিংবা আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেন নি তাদের মাঝে জাহিলি যুগের বেদুঈনী স্বভাব তথা গোত্রীয় অহমিকা, বংশগৌরব, প্রতিশোধস্পৃহা, মাদকাসক্তি, নারীপ্রণয় ইত্যাকার জাহিলি ভাবধারার অনুবর্তন লক্ষ করা যায়; যা তাঁদের রচিত কাব্যে প্রতিফলিত হয় (প্রাগুক্ত, ৬৫)। এ ক্ষেত্রে যে-সব কবির নাম নেয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আয-যিবা'রি (মৃ. ৬৩৬ খ্রি./১৫ হি.), 'আমর ইব্নুল 'আস (মৃ. ৬৬৩ খ্রি./৪৩ হি.), আবু সুফয়ান (মৃ. ৬৫২ খ্রি./৩১ হি.), কা'ব ইব্ন যুহায়র (মৃ. ৬৪৫ খ্রি./২৬ হি.), কায়স ইব্নুল খাতীম (মৃ. ৬২০ খ্রি./০২ হি.পূ.) প্রমুখ।

আলোচ্য যুগে কাব্যসাহিত্যের তুলনায় গদ্যসাহিত্যে ইসলামের প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কেননা এই গদ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে অনবদ্য অলংকারমণ্ডিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, এতেই উপস্থাপিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদিছমালা ও তাঁর অসাধারণ অভিভাষণসমূহ। আর এরই মাধ্যমে আরবি ভাষা সাদামাটা পৌত্তলিক ভাষা হতে ঐশ্বর্যপূর্ণ পুতঃপবিত্র ধর্মীয় ভাষায় রূপান্তরিত হল (শাওকী, তা. বি. : ৪৮০-৪৮১)। ফলে ইসলামের এই যুগে পদ্যের তুলনায় গদ্যের উৎকর্ষ সাধিত হল বেশি। পবিত্র কুরআন ও হাদিছ দ্বারা আলোচ্য যুগের গদ্যশিল্প চরমভাবে প্রভাবান্বিত হয়। দুর্বোধ্য শব্দের পরিবর্তে মধুর শব্দচয়ন, সুদৃঢ় বাক্যবিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গির প্রাঞ্জলতা, প্রভাবক শব্দের ব্যবহার, বাক্য মধ্যস্থিত কুরআনের আয়াত পরিবেশন, কুরআনের বর্ণনাশৈলীর অবলম্বন ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যে এ যুগের গদ্যসাহিত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখ-নিঃসৃত অমিয় বাণী আরবি গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয় (আবদুল, ১৯৮২ : ৫)। পবিত্র কুরআন ও হাদিছ সাহিত্য ক্ষেত্রে যে নবযুগের সূচনা করেছে তার প্রভাব পরবর্তী যুগসমূহে কেবল আরবি সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; বরং অনুবাদের মাধ্যমে তা বিশ্বসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে।

যে রচনারীতি 'ক্ল্যাসিক্যাল আরবি' হিসেবে খ্যাত তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। ভাষার সৌষ্ঠব, শব্দধ্বনির ব্যঞ্জনা, বাক্যবিন্যাসের সরসতায় কুরআন অনবদ্য সৃষ্টি। কুরআনের ভাষা গদ্য হলেও এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের সমস্ত গুণ বিদ্যমান। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, দীর্ঘ ও হ্রস্ব ধ্বনির বৈচিত্র্য, যথোপযুক্ত বর্ণমালার সমাহার প্রভৃতি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, পাঠক বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না। এমনকি বর্তমান যুগেও শুধু ধর্ম-পুস্তক হিসেবেই নয় উৎকৃষ্টতম সাহিত্য হিসেবে মুসলিম অমুসলিম সকল আরবের মাঝে কুরআন পঠিত ও সমাদৃত (সৈয়দ, ১৯৯৭ : ১০)। আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কেবল পবিত্র কুরআনের কারণে এই ভাষার ঐক্য সাধন ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার কুরআনি যুগের যে ভাষা সেই ভাষা প্রায় অবিকৃতভাবে বিভিন্ন আরব অধ্যুষিত অঞ্চলে অদ্যাবধি সাহিত্যিক

ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এর নজির নেই। সত্যি বলতে কি, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের সাহিত্যে যে যুগধর্ম তথা ইসলামের যে প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি তা দেশ হতে দেশান্তরে এবং কাল হতে কালান্তরে সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক ঐতিহাসিক 'মুখাদরাম যুগ' নামে একটি পৃথক যুগ আবিষ্কার করেছেন। আসলে 'মুখাদরাম' নামটি যুগের চেয়েও ব্যক্তির সাথে বেশি সম্পর্কিত। যে-সব কবি জাহিলি ও ইসলামি উভয় যুগ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদেরকে 'মুখাদরাম কবি' বলা হয়। 'জাহিলি' ও 'মুখাদরাম' এই বিভাজন কোন সাহিত্যাদর্শগত নয়। কেননা হাতে গোনা কয়েক জন মুসলিম কবি ছাড়া মুখাদরাম কবিদের এমন কোন স্বাতন্ত্র্যসূচক লক্ষণ চিহ্নিত করা যায় না, যা দ্বারা তাঁদের পূর্ববর্তী জাহিলি যুগীয় কবিদের হতে পৃথক করা যায়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত বলেন, "যেহেতু জাহিলি ও মুখাদরাম কবিদের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, সেহেতু মুখাদরাম কবিদের নিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণিভাগ করা বাহুল্য মাত্র; কেননা তাঁদের কাব্যাদর্শ জাহিলি আদর্শেরই নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘায়িত ধারা।"(আহমাদ, ২০০০ : ৭৯)। আর এ জন্যেই বিশিষ্ট কাব্যসমালোচক মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ. ৮৪৬ খ্রি./২৩২হি.) তাঁর বিখ্যাত *'তাবাকাতুশ-শু'আরা'* নামক গ্রন্থে কবিদের স্তরবিন্যাস করতে গিয়ে মুখাদরাম কবিদের জাহিলি কবিদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন।

৩. উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি./৪০-১৩২ হি.)

উমাইয়া যুগের পরিধি হচ্ছে ৬৬১ খ্রি. হতে ৭৫০ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় নব্বই বৎসর। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আরব মুসলমানগণ সমরাভিযান, সাম্রাজ্য বিস্তার এবং দেশ গঠনেই মূলত সময় ব্যয় করে। সাহিত্যচর্চার মতো অনুকূল আবহ ও ফুরসত তাদের হাতে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানদের সমৃদ্ধি ও ভোগবিলাসিতার কারণে সাবেক জাহিলি আবহ নূতন করে আত্মপ্রকাশ করে। এ যুগে ধর্মীয় বন্ধন শিথিল হওয়ায় বংশীয় আভিজাত্যের তাড়না ও গোত্রীয় অহমিকার পুনর্জাগরণ উমাইয়া সাহিত্যকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে এবং একে জাহিলি যুগের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে এ সময়কার সাহিত্য জাহিলি যুগের ন্যায় প্রধানত কাব্যনির্ভর হয়ে পড়ে। জাহিলি এবং উমাইয়া যুগের কবিতার মধ্যে যে প্রধান তফাত ছিল তা সাধারণত মনস্তাত্ত্বিক। জাহিলি যুগের আবেগ ছিল অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু এর প্রকাশ ঘটত সংকীর্ণ পরিসরে। অপরদিকে উমাইয়াদের আবেগ ছিল সুনিয়ন্ত্রিত, তবে এর প্রকাশ ঘটত খোলামেলা ও বিস্তৃত পরিসরে। সামগ্রিক ভাবনা ও কল্পনায় উমাইয়া কবিগণ জাহিলি কবিদের ভাব-বলয় হতে বের হতে পারেন নি; যদিও চিন্তার ধারাবাহিকতা ও সহজবোধ্য অর্থপ্রকাশে তাঁরা পূর্ববর্তীগণকে ছাড়িয়ে গেছেন (আহমদ, তা. বি. : ১৪২)। প্রাসাদবেষ্টিত নগরজীবনে বসবাস করেও তাঁরা তাঁদের কবিতায় স্থান দিয়েছেন তাঁদের বাপদাদাদের ছেড়ে আসা মরুময় জীবনের সাদামাটা জীবনাচার। তাঁদের কবিতায় উঠে আসত প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার স্মৃতিরোমন্থন এবং ধুধু মরুর বালুকাময় পথ দিয়ে নিঃসঙ্গ উষ্ট্রারোহী বেদুঈনের

পথচলার কথা (Nicholson, 1966 : 235-236)। ভাব ও বিষয়গতভাবে উমাইয়া কবিগণ জাহিলি কবিদের অনুগামী হলেও কাব্যের দেহরূপ দানে উমাইয়া কবিগণ স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। জাহিলি কাব্যে যেখানে অপরিচিত শব্দ ও দুর্বোধ্য বা জটিল বাক্যের ছড়াছড়ি, সেখানে উমাইয়া কবিগণ অনারবীয় প্রভাব ও দুর্বল গাঁথুনি হতে কবিতাকে রক্ষা করার পাশাপাশি অপরিচিত শব্দ ও বাক্যের দুর্বোধ্যতাকে সযত্নে পরিহার করেছেন। ফলে কাব্যালংকারের দিক থেকে আরবি সাহিত্যের যুগসমূহের মধ্যে উমাইয়া যুগের কবিতা অধিক ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ (জুরজী, তা. বি. : ১ : ২৩৩)।

উমাইয়া খলিফাগণ আরব নৃগোষ্ঠী ও আরবীয় মূল্যবোধের প্রতি অনুরক্ত হলেও ইসলামের বহু অনুশাসন হতে তাঁরা দূরে সরে পড়েন। আরবীয় সংস্কৃতি ও চেতনাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা চালালেও তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদিনের অনুসৃত পথের বিপরীত ধারায় চলতে থাকেন। সেই সাথে খিলাফতকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক ও উত্তরাধিকারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে আরব জাতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানা উপদল ও উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় খিলাফতকে কেন্দ্র করে যুবায়রী, খারিজি, শিয়া, উমাইয়া ইত্যাদি নানা দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। আর এ সব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলাদলির কাতারে বহু কবি সাহিত্যিক শামিল হয়ে যান। প্রত্যেক কবি স্ব স্ব দলের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে এবং প্রতিপক্ষ দলকে ঘায়েল করতে কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে কবিগণও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত হন। এ ক্ষেত্রে কবি 'উবায়দ 'উল্লাহ ইব্ন কায়স আর-রুকাইয়্যাত (মৃ. ৬৯৪ খ্রি./৭৫ হি.) যুবায়রী গোষ্ঠী, 'ইমরান ইব্ন হিত্তান (মৃ. ৭০৩ খ্রি./৮৪ হি.) ও আত-ত্বিরিম্মাহ (মৃ. ৭৪৩ খ্রি./১২৫ হি.) খারিজি গোষ্ঠী এবং কুছায়্যির 'আয্যাহ (মৃ. ৭২৩ খ্রি./১০৫ হি.) ও আল-কুমায়ত (মৃ. ৭৪৪ খ্রি./১২৬ হি.) শিয়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (শাওকি, তা. বি. : ৪৮০-৪৮১)।

জাহিলি যুগে গোত্রে গোত্রে এবং ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে 'হিজা' তথা নিন্দামূলক কাব্য রচিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় উমাইয়া যুগে দলীয় ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কবিতার আশ্রয় নেয়া হয়। তবে আগের 'হিজা' কবিতার সাথে এ যুগের 'হিজা' কবিতার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। পূর্বে যেখানে গোত্রীয় অহমিকার স্থান ছিল সেখানে আলোচ্য যুগের কবিতাগুলোর অধিকাংশই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রচিত। তাই এসবকে 'আল-হিজা আস-সিয়াসী' তথা রাজনৈতিক কুৎসা নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই কবিতাগুলো ছিল একেবারেই নিষ্প্রাণ; কেননা এগুলোতে কবির প্রাণের আসল অনুভূতি ফুটে ওঠে নি। তাঁরা দলীয় বা রাজনৈতিক স্বার্থে এসব কাব্য রচনা করেছেন (আহমদ, ২০০৪ : ১ : ৮-৯)। তদুপরি এসব কবি সম্পূর্ণ অর্থ-স্বার্থের কারণেই নিজেদের এ সব দ্বন্দ্ব-কাব্যে জড়িয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায়, কবি নিছক অর্থের লোভে নিজের ভিন্নমতাদর্শী লোকের পক্ষ হয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন ('উমার, ১৯৮৪ : ১: ৩৬৪)। উপর্যুক্ত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে এ সময় উমাইয়া কাব্যাঙ্গনে এক নূতন শিল্পের উদ্ভব ঘটে যাকে 'নাকায়িদ' সাহিত্য নামে অভিহিত করা হয়। সাহিত্যের এ অঙ্গনে জারির (মৃ. ৭২৯ খ্রি./১১০), ফারাযদাক (মৃ. ৭৩০ খ্রি./১১২ হি.) ও

আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি./৯২ হি.)-এর নাম সর্বজনবিদিত। উমাইয়া যুগে জারির ও ফারাযদাক এবং জারির ও আখতালের মাঝে যে কাব্য-লড়াই হয়েছে তা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। এ প্রতিযোগিতার ফলে আরবি সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি আরবি ভাষাও হয়েছে পরিপুষ্ট (আ.ত.ম., ১৯৮৬ : ২০২)।

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবির আক্রমণাত্মক কাব্যের প্রত্যুত্তরে অপর কবি যে কাসিদা রচনা করেন তাকে নাকায়িদ বলা হয়। নাকায়িদে একজন কবি আত্মগৌরব ও গোষ্ঠীগৌরব প্রকাশে ব্যাপৃত হন। নিজের বদান্যতা, বীরত্ব ও কাব্যপটুতা এবং স্বগোষ্ঠীর বংশমর্যাদা, যুদ্ধজয়ের কাহিনি ও মহান কীর্তিসমূহ কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস পান। পাশাপাশি প্রতিপক্ষ কবি ও তার গোষ্ঠীর দোষত্রুটি ও নিন্দনীয় কার্যাবলির ফিরিস্তি প্রদান এবং অতীতে সংঘটিত কোন যুদ্ধে তারা পরাস্ত হলে তার পরাজয়ের গ্লানি তাদের উপর লেপন করতে তৎপর হন। নাকায়িদ সাহিত্যের ভাষায় দুর্ব্যবহার, অশ্রাব্য গালাগাল ও অশ্লীলতার চরম রূপ লক্ষ করা যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বী কবিদ্বয়ের কেউ কখনো অপরের সৃষ্টিগত দোষত্রুটি যেমন কুঁজা, খোঁড়া, কানা ইত্যাকার দৈহিক বিষয়ের অবতারণা করতেন না। কেবল চারিত্রিক ও স্বভাবগত বিচ্যুতিসমূহকে ভয়ানক রূপ দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন ('উমার, ১৯৮৪ : ১ : ৩৬২)। নাকায়িদ সাহিত্য প্রমাণ করে, ইসলামের অর্ধ শতাব্দীকাল অতিবাহিত হলেও জাহিলি যুগের কুলজি-গৌরব ও গোত্রীয় অহমিকা আরবদের কাছ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয় নি; বরং উমাইয়া কবিদের মাঝে এর প্রচ্ছন্ন প্রভাব স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

উমাইয়া যুগে গযল বা প্রণয়কাব্যে যে নতুনত্ব ও সংস্কার লক্ষ্য করা যায় তা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবন হতে সৃষ্ট উমাইয়া কবিদের প্রণয়গীতি এবং জাহিলি কবিদের রীতিসিদ্ধ প্রণয়গীতির মাঝে ঢের তফাত রয়েছে। উমাইয়া কবিদের অনেকেই গজল সাহিত্যকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা কেবল এটাকে উপজীব্য করেই একটি দীর্ঘ কাসিদার পূর্ণ দেহনির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন এবং এর রসাস্বাদনে সার্থক হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেক কবি রয়েছেন যাঁরা প্রণয়গীতি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কাব্য রচনায় অনীহা প্রকাশ করতেন কিংবা অক্ষমতা স্বীকার করতেন। অপরদিকে জাহিলি কবিগণ প্রণয়কাব্যকে পৃথক শিল্প হিসেবে নেন নি; বরং অন্য বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গী হিসেবে এটাকে স্বীয় কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। যেমন একটি কাসিদার স্টাইলিস্টিক কারণে প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার স্মৃতিচারণ, প্রেয়সীর নিমিত্ত অশ্রুবিসর্জন ও তার প্রস্থানের বর্ণনাদান ইত্যকার বিষয়ের অবতারণা করতেন। অন্যথায় জাহিলি যুগে এমন একজন কবিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার কাব্য নিছক প্রণয়গীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ (ত্বাহা, তা. বি. : ২ : ১৫-১৬)। উমাইয়া যুগে প্রণয়কাব্যে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে জামিল ইব্ন মা'মার (মৃ. ৭০১ খ্রি./৮২ হি.), 'উমার ইব্ন আবি রাবি'আ (মৃ. ৭১২ খ্রি./৯৩ হি.), কুছায়্যির 'আযযাহ (মৃ. ৭২৩ খ্রি./১০৫ হি.) প্রমুখ অন্যতম। জাহিলি প্রণয়গীতি এবং উমাইয়া প্রণয়গীতিতে মৌল পার্থক্য হচ্ছে মরু-প্রভাব ও নগর-প্রভাব। উমাইয়া সাহিত্যের বিশেষত কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর প্রতি ছত্রে

নগরসভ্যতার ছাপ। একশ বছর পূর্বেও যে আরবরা মরুভূমিতে যাযাবর হিসেবে বিচরণ করে বেড়াত, তাদের বংশধরই নতুন পরিবেশে নতুন সভ্যতা ও সাহিত্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় (সৈয়দ, ১৯৯৭ : ১৪)। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের যে প্রবাহ শুরু হল তা কেবল বাসরা, কুফা ও দামিস্ককেই নাড়া দেয় নি; বরং হিজাযের দুই নগর মক্কা এবং মদিনাকেও স্পর্শ করল। ফলে দেখা যায়, এ সময় ইসলামের পবিত্র এই নগরদ্বয়েও সংগীতের চর্চা ও রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের প্রসার ঘটে (শাওকি, তা. বি.খ : ৩৩)।

উমাইয়া যুগে সাহিত্যিক যে রূপান্তর ঘটে তা একদিকে যেমন কবিতার বিষয়বস্তুতে, অপরদিকে কবি-মানসেও লক্ষ করা যায়। এ সময় কবিদের মাঝে সামাজিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের উপর নিজেদের অভ্যন্তরীণ মনোজগতকে তথা স্বীয় অনুভূতি, আসক্তি, প্রেম-ভালোবাসা ও রাগ-বিরাগকে প্রাধান্য দানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের চেয়ে উমাইয়া যুগের কবির মধ্যে মোহাবিষ্টতা ও অনৈর্ব্যক্তিকতা অধিকহারে লক্ষণীয়। উমাইয়া সাহিত্যের যুগধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে ত্বাহা হুসায়ন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) বলেন, "আরবি সাহিত্যাঙ্গনে কেবল আব্বাসীয় যুগেই সংস্কার ও নবজাগরণ ঘটেছে এ কথা বললে উমাইয়া যুগের উপর অবিচার করা হয়। কেননা রূপতাত্ত্বিক, অর্থগত ও বিষয়গতভাবে উমাইয়া যুগেই সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয়; তবে সেই প্রচেষ্টা পূর্ণতালাভ করতে পারে নি। প্রথমত উক্ত যুগের নাতিদীর্ঘ সময়কালের কারণে, দ্বিতীয়ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে।" (ত্বাহা, তা. বি. : ২ : ১৪)।

৪. আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি./১৩২-৬৫৬ হি.)

ইসলামের 'সোনালী যুগ' খ্যাত আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় এবং সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়; যেখানে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতিরও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। আব্বাসীয় যুগের পরিধি হচ্ছে ৭৫০ খ্রি. হতে ১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত, প্রায় পাঁচ শতাব্দীকাল। আব্বাসীয় যুগের পরিধিতে তথা খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব পর্যন্ত কালে আরবিভাষী জনগোষ্ঠীই ছিল গোটা বিশ্বে সভ্যতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার মশালবাহী। তাদের মাধ্যমেই প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শনের পুনরুদ্ধার, নবসংস্করণ ও সম্প্রসারণ ঘটেছিল (Hitti. 1968 : 557) যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সাহিত্যকেও দোলা দিয়েছিল। আব্বাসীয় যুগে আরবীয় সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডগত বিস্তৃতি ও কালগত পরিসর সুদীর্ঘ হওয়ায় সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত যুগকে চারটি পর্বে ভাগ করেন। প্রতিটি পর্বই রাজনৈতিক আদর্শগত স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি পৃথক সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। পর্বসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

৪.১. পারসিক পর্ব (৭৫০-৮৪৬ খ্রি./১৩২-২৩২ হি.);
৪.২. তুর্কি পর্ব (৮৪৬-৯৪৬ খ্রি./২৩২-৩৩৪ হি.);
৪.৩. বুওয়ায়হি পর্ব (৯৪৬-১০৫৫ খ্রি./৩৩৪-৪৪৭ হি.);
৪.৪. সালজুকি পর্ব (১০৫৫-১২৫৮ খ্রি./৪৪৭-৫৬৫ হি.)।

আব্বাসীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণগোষ্ঠীর পালাবদল এবং শাসনক্ষমতার পটপরিবর্তনের নিরিখে এই শ্রেণিবিভাজন করা হলেও দেখা যায়, এই পরিবর্তনের ছোঁয়া আরবীয় শিল্প-সাহিত্যে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে। ফলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালেও এই বিভাজন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৪.১. পারসিক পর্ব (৭৫০-৮৪৬ খ্রি./১৩২-২৩২ হি.)

আব্বাসীয় যুগের ১ম পর্বটি যেটি আমরা 'পারসিক পর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করেছি, তা মূলত বাগদাদকেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার যুগ। আর এ সময়েই আরব ভূখণ্ড জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানমর্যাদায় স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছিল। পারস্য প্রভাব, বৌদ্ধিক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় শৈথিল্য আলোচ্য পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকে নাড়া দিয়েছে। আব্বাসীয় যুগের আলোচ্য পর্বই সাহিত্য-সংস্কৃতির চরম বিকাশ পর্ব হিসেবে পরিগণিত। উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী ছিল খাঁটি আরবীয় মেজাজের। আরবি ভাষা, সাহিত্য ও মরুসংস্কৃতির প্রতি তাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাদের রাজধানীও স্থাপিত হয়েছিল মরুভূমির কোল ঘেঁষে সিরিয়ার দামিস্ক নগরীতে। তাদের সৈনিক, সেনাপতি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ কর্মযজ্ঞের সকল স্তরে মুখ্য ভূমিকা পালনকারীগণ খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত ছিল। যার ফলে তাদের সাহিত্যাঙ্গনে বহির্জগতের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গৌণ। অপরদিকে আব্বাসীয় খেলাফত ছিল পারসিক রঙে রঞ্জিত। কেননা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল পারসিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা। তাদের রাজধানীও গড়ে তোলা হয়েছে পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকা বাগদাদ নগরীতে (আহমাদ, ২০০০ : ১৫৩)। ক্রমান্বয়ে খলিফা ও শাসকবর্গ দাপ্তরিক, রাষ্ট্রিক সকল কর্মকাণ্ডে অনারব মাওয়ালিদের ব্যবহার করতে থাকে। খলিফাগণ আরব নেতৃবৃন্দ ও গোত্রীয় সর্দারদের পরিবর্তে পারসিক বুদ্ধিজীবীদের উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন। এতে আরবীয় প্রভাব ম্রিয়মাণ হতে থাকে। এই সুবাদে রাষ্ট্র গঠনে পারস্য, তুর্কি, সুরিয়ানি ও রোমক উপাদান অনুপ্রবেশ করে এবং সেমেটিক সভ্যতার সাথে আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে বাগদাদকেন্দ্রিক এমন এক নগর-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে, যে সাহিত্য ইতঃপূর্বে জাহিলি-ইসলামি-উমাইয়া যুগে মরুনির্ভর সমাজে দৃশ্যমান হয় নি (আহমদ, ১৯৯৯ : ২ : ১৫৩)।

অতীতে গ্রীকদের সাথে রোমানদের যেমন সম্পর্ক ছিল ঠিক তেমনি পারস্যের সাথে আরবদেরও নানা দিক থেকে অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারস্য সভ্যতা আরব সভ্যতা হতে প্রাচীনতর। যখন আরবরা ইসলামের বদৌলতে পারস্য জয় করে তখন উভয় সভ্যতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং এ ক্ষেত্রে পারস্য সভ্যতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেমনটি রোমানরা গ্রিক রাষ্ট্রকে রাজনৈতিকভাবে জয় করলেও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে রোমানরা গ্রীকদের উপর সাফল্য অর্জন করতে পারে নি; বরং তদবধি গ্রিক সাহিত্যেরই জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল (ত্বাহা, তা. বি.: ২ : ২৭)। পারসিক সভ্যতা আরবীয় সাহিত্যজগতে কেবল জাঁকজমকপূর্ণ রচনাশৈলীই আমদানি করে নি; বরং উপযুক্ত শব্দনির্বাচনের কুশলতা, অনুভূতির কোমলতা ও গভীরতা, সর্বোপরি উন্নত ও আধুনিক চিন্তাভাবনার এক সমৃদ্ধ

ভাণ্ডার বহন করে এনেছিল। এ সময়ের কবিগণ তাঁদের কবিতায় নগরবিষয়ক অর্থ উদ্ভাবন এবং দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োগে সচেষ্ট হন। কেননা এ যুগের অধিকাংশ কবি দুই রক্তধারায় ভূমিষ্ঠ, দুই ভাষা ও সাহিত্যে পরিপুষ্ট এবং দুই ভিন্ন সভ্যতায় লালিত। আর এই পরাগায়নের প্রভাব তাদের বুদ্ধি ও মননে সার্থকরূপে প্রতিফলিত হয়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাশ্শার ইব্ন বুর্দ (মৃ. ৭৮৪ খ্রি./১৬৭ হি.), আবু নুওয়াস (মৃ. ৮১৫ খ্রি./১৯৯ হি.), আবুল 'আতাহিয়া (মৃ. ৮২৬ খ্রি./২১১ হি.), ইব্নুর রূমী (মৃ. ২৮৪হি./৮৯৭ খ্রি.) প্রমুখ কবির কবিতায় অভিনব অর্থ সৃষ্টিতে লক্ষ করা যায় (আহমাদ, ২০০০ : ১৮২)। তাঁরা প্রথাগত কবিতার মৌল বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে তার সাথে নবযুগ, নবসমাজ, নবসভ্যতা ও নবসংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে কবিতার নবধারা আবিষ্কার করেন।

আব্বাসীয় যুগে নবরাজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে আরবি ভাষার দিগন্ত দিন দিন সম্প্রসারিত হতে লাগল। পারস্য, ভারতীয় ও গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে বহু পরিভাষা জন্মলাভ করল। এ ক্ষেত্রে খলিফা আল-মামুন (মৃ. ৮৩৩ খ্রি./২১৮ হি.) প্রতিষ্ঠিত 'দারুল হিকমা' অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু মাওয়ালিগণ কর্তৃক সহজসরল শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে স্বাচ্ছন্দ্য রীতির প্রাধান্যদান আরবি ভাষাকে আরো পরিশীলিত করে তোলে। কেননা তারা আরবি ভাষাকে আত্মস্থ করেছে পঠনপাঠনের মাধ্যমে, স্বভাবগত ও ঐতিহ্যসূত্রে নয় (প্রাগুক্ত : ১৫৪), যে-কারণে আব্বাসীয় সাহিত্যে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুতে খাঁটি আরবীয় আমেজ অক্ষুণ্ন থাকে নি। এ সময় আরবি সাহিত্যে এমন অনেক বিষয়ের আগমন ঘটে যার সাথে আরব-সংস্কৃতি ইতঃপূর্বে পরিচিত ছিল না। সাহিত্যে বেদুঈন আরবের মরুপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে নগরজীবনের বিস্তৃত আলোচনা আব্বাসীয় সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছে। রচনাশৈলীতে সংক্ষিপ্ত ছন্দে নাতিদীর্ঘ কবিতা অধিকহারে লক্ষণীয় ('উমার, ১৯৮৪ : ২ : ৪০)। নবসভ্যতার রসাস্বাদনে ও নবাবিষ্কৃত বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর ব্যাপকতা লাভ করে। নৌবহর, নৌবিহার ও নৌপথে যুদ্ধের বর্ণনা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হিসেবে সংযোজিত হল, যা পূর্বেকার কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে পরিদৃষ্ট হয় নি। তাছাড়া বৌদ্ধিক জাগরণের ফলে যে কোন বিষয় উপস্থাপনে যুক্তির অবতারণা আব্বাসীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (আহমদ, ১৯৯৯ : ২ : ৩০০)। চিন্তার ধারাবাহিকতা ও প্রসঙ্গান্তরে আনুপূর্বিকতা রক্ষা করা এ সময়কার কাব্যসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা প্রাচীন আরবি কাব্যে সুরক্ষিত হত না (আহমদ, তা. বি. : ২৪৬)।

আব্বাসীয় সমাজে নির্লজ্জতা ও ইন্দ্রিয়লালসার সয়লাব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে। লাম্পট্য ও পাপাচারের খোলামেলা আলোচনা সাহিত্যে বিশেষত কাব্যে ব্যাপকহারে প্রতিবিম্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে ত্বাহা হুসায়ন মন্তব্য করেন, "আলোচ্য যুগের বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা বাস্তবে ও লেখনীতে এত বেশি সীমালঙ্ঘন করে যে, এমন বহু কবিতা রয়েছে যা কাব্যগ্রন্থে পড়া যাবে কিন্তু শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করা যাবে না।" তিনি আরো তথ্য দেন যে, মিশরীয় প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল কুতুবে' আবু নুওয়াসের জীবনতথ্য সংবলিত এমন একটি গ্রন্থ বিদ্যমান যা রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে প্রকাশ করা যাচ্ছে না (ত্বাহা, তা. বি. : ২

: ২৪)। অবশ্য বিপরীতে এ সময় চারিত্রিক পদস্খলন ও ধর্মীয় শৈথিল্যের প্রতিকারস্বরূপ সুফিবাদ ও পার্থিব জীবনবিমুখতা-নির্ভর এমন কিছু কাব্য সৃষ্টি হয় যা ইতঃপূর্বে আরবি কাব্যে আর দেখা যায় নি। এ অঙ্গনে কবি আবুল 'আতাহিয়ার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা যায়। আব্বাসীয় কাব্যসাহিত্যকে বিষয়গত দিক থেকে প্রাচীন ধারার অনুবর্তন মনে হলেও এ যুগের কবিগণ আরবি কবিতার পুরাতন দেহে নবপ্রাণের সঞ্চার করেছেন এবং প্রাচীন অবয়বের উপর কারুকার্য প্রদর্শনে নতুনত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই নতুনত্ব কেবল সহজ-সরল শব্দচয়নেই নয়; বরং উক্ত শব্দাবলির অলংকরণ ও শোভাবর্ধনেও দেদীপ্যমান। আব্বাসীয় কবিগণ খলিফাদের ন্যায় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি ও গৃহস্থালি সামগ্রীকে যেমন সুসজ্জিত ও আধুনিকায়নের চেষ্টা করেছেন তেমনি কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলিকেও তাঁরা অপরূপ সাজে সাজাবার চেষ্টা করেন (বুতরুস, ১৯৮৯ক : ২০)।

কাব্যের ন্যায় গদ্যসাহিত্যেও নবযুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতঃপূর্বে গদ্যের পরিমণ্ডল অত্যন্ত সীমিত ছিল। আব্বাসীয় যুগে উন্মুক্ত সংস্কৃতির বদৌলতে গদ্যের নব নব শাখা উন্মোচিত হতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সুফিতত্ত্ব এবং বিচিত্র শরিয়তি ও ফিক্‌হি মতাদর্শের উদ্ভব ও পর্যালোচনা গদ্যের সীমারেখাকে সম্প্রসারিত করেছে। কাব্যের ন্যায় গদ্যশিল্পও পারস্য এবং গ্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। প্রথমত লেখকগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ পারসিক মাওয়ালি সম্প্রদায়। তাঁরা বহু ফারসি গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে আরবিতে আমদানি করেন, যার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ফারসিশৈলী আরবি গদ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, তৎকালে গ্রিক হচ্ছে নিকট প্রাচ্যের জাতীয় ভাষা। এতদ্‌অঞ্চলে গ্রীক শিক্ষালয় ব্যাপকহারে গড়ে ওঠে যেখানে দর্শন, সাহিত্য ও গ্রিসীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিখন-শিক্ষণের কাজ চলত। যখন এ সব রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন ঘটে তখন এসব দ্বারা আরবদের বিদ্যাবুদ্ধি ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়। যেমন আরবি গদ্যকারদের অগ্রদূত খ্যাত ইব্‌নুল মুকাফ্‌ফা' (মৃ. ৭৫৯ খ্রি./১৪২ হি.) পারস্য বংশোদ্ভূত হওয়া ছাড়াও তিনি গ্রিক সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার অর্জন করেছিলেন (ত্বাহা হুসায়ন, তা. বি. : ২ : ৩০-৩১)। ফলত দেখা যায়, আব্বাসীয় গদ্যে যে রূপান্তর ঘটে তা দু দিক থেকে আসে। প্রথমত অনুবাদের সুবাদে বহির্জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত অনারব নৃগোষ্ঠীর মাধ্যমে যারা নিজেদের আরব জাতিভুক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁরা আরব সংস্কৃতিতে কেবল তাঁদের স্বজাতির জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা আমদানি করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং তাঁদের স্বভাবচরিত্র, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনাচার সবই সাথে করে নিয়ে আসেন। আর এসব শক্তিশালী উপাদান আরবি গদ্যে বিচিত্র শাখাপ্রশাখার উদ্ভবে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে (শাওকি, তা. বি.ক : ৪৪১)।

৪.২ তুর্কি পর্ব (৮৪৬-৯৪৬ খ্রি./২৩২-৩৩৪হি.)

আব্বাসীয় যুগের ২য় পর্ব হচ্ছে তুর্কি পর্ব। এটি মূলত তুর্কি সেনা প্রভাবিত যুগ। এ সময় রাজনৈতিক বলয় পারস্যদের হাত হতে তুর্কিদের হাতে চলে যায়। পারসিকদের ন্যায় তুর্কিরা যেহেতু শিক্ষা ও সভ্যতায় ততটা উন্নত ছিল না, সেহেতু পারসিকরা যে হারে

নিজেদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরবিতে আমদানি করেছিল সে হারে তুর্কিরা পারে নি। ফলে তাদের মধ্য হতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে নি যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবধারা সৃষ্টি করেছেন। বরং পূর্বতন পারস্য ও রোমক প্রভাবিত সাহিত্যধারাই অব্যাহত থাকল (বুতরুস, ১৯৮৯ক : ২১১)। মূলত আব্বাসীয় যুগের ১ম পর্ব ও ২য় পর্বের মাঝে রাজনৈতিক পালাবদল ছাড়া সাহিত্যজগতে মৌলিক কোন পার্থক্য সূচিত হয় নি বললেই চলে। তবে প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ যুগে যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ হয়। আব্বাসীয় যুগের ১ম পর্বে হাম্মাদ আর-রাভিয়া (মৃ. ৭৭২ খ্রি./১৫৫ হি.), আল-আসমা'ঈ (মৃ. ৮৩১ খ্রি./২১৫ হি.), আবু 'উবায়দা (মৃ. ৮২৫ খ্রি./২০৯ খ্রি.) প্রমুখ সাহিত্য-সংগ্রাহকগণ যেখানে অতীতের কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস যেখানে যা কিছু পেয়েছেন বা শুনেছেন নির্দ্বিধায় ও নির্বিচারে তা আহরণ করেছেন, সেখানে ২য় পর্বে এসে আল-জাহিয (মৃ. ৮৬৯খ./২৫৫ হি.), ইব্ন কুতায়বা (মৃ. ৮৮৯ খ্রি./২৭৬ হি.) প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকগণ তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুসন্ধান ও যাচাই বাছাই শুরু করলেন। পাশাপাশি সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত শাখাকে শ্রেণিবিন্যাস করলেন যা সাহিত্যপিপাসুদের রসাস্বাদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করল (জুরজি, তা. বি. : ২ : ১৬৯-১৭০)।

৪.৩ বুওয়ায়হি পর্ব (৯৪৬-১০৫৫ খ্রি./৩৩৪-৪৪৭ হি.)

বুওয়ায়হি পর্বে কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় নৈসর্গিক রূপায়ণ ও উৎসবাদি উদযাপনের চিত্রায়ণ অধিক হারে লক্ষণীয়। কেননা বুওয়ায়হি সাম্রাজ্য ছিল সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার রাজ্য। সুতরাং ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণনা, ফলেফুলে ভরা উদ্যানাদির আবাহন এবং নববর্ষ উদযাপনের বিবরণ সামসময়িক কবিদের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি পারসিক জাতির অতীত সমৃদ্ধ সভ্যতা ও ঐতিহ্য এবং তাদের জাতীয় অনুষ্ঠানাদির বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে (মুহাম্মদ, ১৯৯৯ : ২ : ৬৩১)। আলোচ্য যুগে দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে ব্যাপকহারে। পূর্ববর্তী যুগে আহৃত বিদেশি জ্ঞানবিজ্ঞানে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বুদ্ধিজীবীরা বহির্জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি আহরণের চেয়ে ইতঃপূর্বেকার আহৃত ভাণ্ডারে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানী গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ফলে গ্রিকদর্শনের পাশাপাশি ইসলামি দর্শন সৃষ্টিলাভ করে এবং আল-ফারাবি (মৃ. ৯৫০ খ্রি./৩৩৯ হি.), ইব্ন সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি./৪২৮ হি.) প্রমুখ দার্শনিকের পাশাপাশি আল-মা'আর্‌রি (মৃ. ১০৫৭ খ্রি./৪৪৯ হি.)-এর মতো দার্শনিক কবিরও আবির্ভাব ঘটে। একইভাবে দর্শনতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সুফিতত্ত্বেরও বিকাশ ঘটে এবং সুফিবাদী কবি জন্মলাভ করে (বুতরুস, ১৯৮৯ক : ৩০১-৩০২)। বুওয়ায়হিদের পৃষ্ঠপোষকতায় আবুল ফারাজ আল-ইসপাহানি (মৃ. ৯৬৭ খ্রি./৩৫৬ হি.) *কিতাবুল আগানি* এবং ইব্নুন নাদিম (মৃ. ৯৯০ খ্রি./৩৮০ হি.) *আল-ফিহরিস্ত* নামক গ্রন্থ সংকলন করেন, যা আরবি সাহিত্যের ভাণ্ডারে আজও অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯৯৫ : ১৬ [১ম ভাগ] : ৩৬৩)।

৪.৪. সালজুকি পর্ব (১০৫৫-১২৫৮ খ্রি./৪৪৭-৫৬৫ হি.)

সালজুকগণ ছিল বেদুঈন তুর্কি জাতি এবং মতাদর্শগতভাবে সুন্নি মুসলিম। তারা শিয়াপন্থী বুওয়ায়হিদের উৎখাত করে আব্বাসীয়দের কিছুটা ভারমুক্ত করে। কেননা সে সময় বুওয়ায়হিগণ রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে আব্বাসীয় খলিফাগণকে নতজানু করে রেখেছিল (পূর্বোক্ত, ২৪ [২য় ভাগ]: ৫-৬)। সালজুকগণ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ হলেও কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদানে মোটেও কার্পণ্য করে নি। বিশেষত তাদের পারস্য উজির নিজামুল মুল্‌ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নিজামিয়া' শিক্ষালয়টি জগৎখ্যাত ও ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। তবে আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকে এসে সালজুকদের অনাগ্রহের ফলে আরবি কবিতার উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ হতে থাকে। নানা বিশৃঙ্খল ও অশান্তির ছড়াছড়িতে কবিদের সৃজনশীল মানস দুর্বল হয়ে পড়ে। কেবল অতীতের চর্বিতচর্বণের দিকেই তাঁরা ঝুঁকে পড়েন এবং অনারবদের অনুকরণে অতিরঞ্জন, অলংকারের বাগাড়ম্বর ও আমির উমরাদের চাটুকারিতায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। এমন কি কবিদের কাব্য মিথ্যার বেসাতি ও ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয় (আহমাদ, ২০০০ : ১৮৩)। আব্বাসীয় যুগের এ পর্বে আরব জাতির উপর অনারবের বহুমুখী প্রভাবে আরবি সাহিত্য ভাষাগত বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং গুণগত দিক থেকেও অধোমুখী হতে আরম্ভ করে। ফলে তাদের শেষ সময়টা যথার্থই 'পতন যুগে'র সূচনা পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয় (বুতরুস, ১৯৮৯ক : ৪২৩-৪২৪)।

খ্রিষ্টীয় ৭৫০ হতে ১২৫৮ পর্যন্ত কিংবা হিজরি ১৩২ হতে ৬৫৬ সন পর্যন্ত পাঁচ শত বছরের সাহিত্যকে 'আব্বাসীয়' সাম্রাজ্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। বাস্তবে আলোচ্য যুগের সাহিত্য বাগদাদে আব্বাসীয়দের, পারস্যে বুওয়ায়হিদের, সিরিয়ায় হামদানিদের, মিশর ও মরক্কোতে ফাতেমীয়দের এবং স্পেনে উমাইয়াদের দ্বারা লালিত ও পরিপুষ্ট (হান্না, ১৯৯১ : ২ : ৩১)। অবশ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'আব্বাসীয়' নামকরণ যথার্থ না হলেও বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক বিচারে সমুদয় যুগকে 'আব্বাসীয়' নামেই অভিহিত করতে হবে। কেননা পরবর্তীকালে অন্য খণ্ডরাজ্যসমূহে সাহিত্যের এমন কোন বিশেষ শাখা সৃষ্টিলাভ করে নি যেটির উৎপত্তি কিংবা সূচনা বাগদাদকেন্দ্রিক ১ম আব্বাসীয় যুগে হয় নি। আসলে পরবর্তী খণ্ডরাজ্যসমূহে সৃষ্ট সাহিত্য কোন কোন ক্ষেত্রে নবরূপে রূপায়িত ও স্বকীয় ধারায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলেও এটা মূলত নির্মাণের পর পরিমার্জন, সূচনার পর পূর্ণতাসাধন এবং বীজ বপনের পর ফসল ফলানোরই নামান্তর (বুতরুস, ১৯৮৯ক : ২৯৯)। অবশ্য এ ক্ষেত্রে স্পেনীয় আরবি কাব্য পৃথক স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। সেখানে কবিগণ প্রকৃতির রূপ ও গন্ধকে সংবেদনশীল মন নিয়ে চিত্রায়িত করেছেন এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। এতে তাঁদের মাঝে ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি ঘটেছে বলা যায় (Nicholson, 1966 : 416)। তবে আব্বাসীয় যুগের ১ম পর্বেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের সকল শাখার উদ্বোধন ঘটেছিল। পরবর্তী স্বাধীন খণ্ডরাজ্যসমূহে এসব শাখাপ্রশাখা ডালপালা ও পত্রপল্লবে সুশোভিত ও বিকশিত হয়েছিল মাত্র।

সত্যি বলতে কি, আব্বাসীয় যুগের আরবি সাহিত্য আরব জাতিসত্তার একক সৃষ্টি নয়; বরং বহুভাষী ও বিচিত্র নৃগোষ্ঠী-অধ্যুষিত মুসলিম বিশ্বের আরব অনারব সকলের সম্মিলিত মনন ও মানসের বহিঃপ্রকাশ ও সমন্বিত প্রয়াসের ফসল। আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে এটি মিশ্রসভ্যতার ইট দিয়ে নির্মিত অক্ষয় সৌধমালা হিসেবে চিহ্নিত (মুসা, ১৯৯৯ : ৩৬০)। উমাইয়া শক্তির পতনে আরবদের ক্ষতি হলেও এতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি এতটুকু ব্যাহত হয় নি। তবে আব্বাসীয়দের পতনে আরবি ভাষা-সাহিত্যের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বাগদাদের পতনে আরবি সাহিত্যের গতিধারায় নেমে আসে এক অস্বাভাবিক বিপর্যয় (আ.ত.ম., ১৯৮৬ : ২২৬-২২৭)। এর ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে নেমে আসে দীর্ঘকালীন বন্ধ্যাত্ব ও স্থবিরতা। বাস্তবেই, আব্বাসীয় যুগের পতন সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় ইতিহাসের বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তি।

৫. পতন যুগ (১২৫৮-১৭৯৮ খ্রি./৬৫৬-১২১৩ হি.)

ইসলামের ইতিহাস ও আরবি সাহিত্যের 'সুবর্ণ যুগ' খ্যাত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যরাজ্যের অবনমন ঘটতে থাকে। মঙ্গোলীয়দের আক্রমণ আরবি সাহিত্যের লীলাভূমি বাগদাদসহ অপরাপর আরব ভূখণ্ডকে তছনছ করে ফেলে। ১২৫৮ খ্রি. চেঙ্গিস খানের (মৃ.১২২৭ খ্রি.) প্রপৌত্র হালাকু খাঁর (মৃ. ১২৬৫ খ্রি.) বাহিনী বাগদাদের খলিফা ও নগরবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি; বরং এর সভ্যতার নিদর্শনাবলি, শিক্ষার সমুদয় অবকাঠামো ও উপকরণসমূহকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। গ্রন্থাগারের হাজার হাজার পুস্তক টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। সভ্যতা যেন তখন জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যভাণ্ডারের সমাধির উপর নীরবে নিভৃতে কাঁদছিল (হান্না, ১৯৯১ : ৩ : ৩৮৫)। আরবদের জাতীয় জীবনে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হওয়ার পর স্বভাবতই তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনায় অবক্ষয় নেমে আসে। এ সময় তারা কেবল একটি আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হল শুধু তাই নয়; বরং ব্যক্তি হিসেবেও আত্মমর্যাদাবোধহীন হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তাদের অদম্য মানসিক শক্তি ও সৃজনশীল ক্ষমতাও লোপ পেতে থাকল। ফলে সাহিত্যাঙ্গনে নেমে আসল বন্ধ্যাত্ব ও অস্থিরতা। আর তাই সাহিত্যের এই দুঃসময়কে ঐতিহাসিকগণ 'পতন যুগ' ('আসরুল 'ইনহিত্বাত) নামে আখ্যায়িত করলেন। যার সীমারেখা ১২৫৮ খ্রি./৬৫৬ হি. হতে ১৭৯৮ খ্রি./১২১৩ হি. পর্যন্ত। যার পরিধি প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাব্দীকাল।

আরব ভূখণ্ডে তথা মুসলিম বিশ্বের উপর সাড়ে পাঁচ শত বছর অতিবাহিত হয়, কিন্তু আরবের ঝাণ্ডাবাহী কোন নেতৃত্ব ছিল না। বলা যায়, কোন ক্ষেত্রে তাদের অংশীদারিত্ব ছিল না। উপরন্তু তাদের স্থাপনা ও কীর্তিসমূহ মঙ্গোলীয় ও তুর্কিদের লুণ্ঠনদ্রব্যে পরিণত হয় (আহমাদ, ২০০০ : ২৯৫)। সুতরাং এ সময় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। তবে মিশর ও সিরিয়ায় মামলুক রাজাদের ছত্রছায়ায় এবং তৎপরবর্তী 'উছমানি শাসকদের আংশিক পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি সাহিত্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় (জুরজি, তা. বি. : ৩ : ১২২)। পতন যুগের সাহিত্যকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

৫.১. মামলুকি পর্ব (১২৫৮-১৫১৭ খ্রি./৬৫৬-৯২৩হি.);
৫.২. 'উছমানি পর্ব (১৫১৭-১৭৯৮ খ্রি./৯২৩-১২১৩হি.)।

৫.১ মামলুকি পর্ব (১২৫৮-১৫১৭ খ্রি./৬৫৬-৯২৩ হি.)

১২৫৮ খ্রি. বাগদাদের পতনের পর ইরাকের পরিবর্তে মিশরই জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই মিশর হচ্ছে মামলুক শাসকদের রাজধানী। আসলে পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডে ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির সাথে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সাহিত্যের বিকাশগতি আশা করা যায় না। মামলুক শাসকগণ মিশরকে স্বদেশরূপে, ইসলামকে ধর্মরূপে এবং আরবিকে স্বভাষারূপে গ্রহণ করেন। তাঁরা জ্ঞানীগুণী ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ফলে এ সময় এমন একদল বিদ্যোৎসাহী লোকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা পূর্ববর্তী আব্বাসীয় যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যকে সংরক্ষণ, সংকলন, পরিমার্জন ও পরিশোধন করে সুবিন্যস্ত করেন (আহমাদ, ২০০০ : ২৯৬)। এ সময় সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চা না হলেও জ্ঞানের বহুবিধ বিষয় নিয়ে কোষজাতীয় গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইতিহাস ও সাহিত্যের বৃহদাকারের অধিকাংশ প্রামাণিক উৎসগ্রন্থ এ যুগেই রচিত হয়। আন-নুওয়ায়রি (মৃ. ১৩৩২ খ্রি./৭৩৩ হি.), আল-কাল্‌কাশান্দি (মৃ. ১৪১৮ খ্রি./৮২১ হি.), ইব্‌ন ফাযলুল্লাহ আল-'উমারি (মৃ. ১৩৪৯ খ্রি./৭৪৯ হি.), আস-সাফাদি (মৃ. ১৩৬৩ খ্রি./৭৬৪ হি.), ইব্‌ন মানযুর (মৃ. ১৩১১ খ্রি./৭১১ হি.) প্রমুখ কোষপ্রণেতা ও অভিধান রচয়িতাগণ এ যুগেরই সৃষ্টি (জুরজি, তা. বি. : ৩ : ২৯০; মুহাম্মদ, ১৯৯৯ : ২ : ৬৪৩)। আরবি মামলুকিদের মাতৃভাষা না হলেও তাঁরা এই ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এতেই সরকারি নানা পরিপত্র ও প্রচারপত্র প্রকাশ করতেন। তবে আরবি ভাষায় তাঁদের দুর্বলতার কারণে বিশুদ্ধ ও শিল্পসম্মত আরবি কবিতার চেয়ে আঞ্চলিক লোকগীতিকেই তাঁরা প্রাধান্য দেন। ফলে কবিদের চেয়ে লোকশিল্পীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আরবি ভাষা আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট হয় (বুতরুস, ১৯৮৯খ : ২১০)।

৫.২ 'উছমানি পর্ব (১৫১৭-১৭৯৮ খ্রি./৯২৩-১২১৩ হি.)

১৫১৭ খ্রি./৯২৩ হি. সনে তুর্কি বংশোদ্ভূত 'উছমানিরা সিরিয়া ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে। প্রায় চার শতাব্দীকালব্যাপী তারা আরব ও মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশ শাসন করে। সিরিয়া, মিশর, ইরাক, মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়াসহ আরব অধ্যুষিত অঞ্চলের বৃহৎ অংশ সুদীর্ঘকাল তাদের শাসনাধীনে ছিল। 'উছমানিগণ আরবি ভাষার পরিবর্তে তুর্কি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করে। এতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চরম উপেক্ষার সম্মুখীন হয়। অতীতের বিজেতা ও স্বাধীনচেতা আরব জাতি এখন রাজ্যহারা ভাষাহারা হয়ে মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে নিজেদের সৃজনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। অস্থিতিশীল পরিবেশ ও অস্থিরতার সর্বগ্রাসী থাবায় মানুষের প্রতিভা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক জীবনে নেমে আসে জীর্ণতা ও দৈন্য। ফলে রচনাশৈলীতে সৃষ্টিশীলতা ও গতিশীলতার পরিবর্তে প্রাণহীন অনুকারিতা ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। অর্থহীন অলংকরণ ও

বৈচিত্র্যহীন সাজসজ্জার পেছনেই কবি সাহিত্যিকদের অতি উৎসাহ লক্ষ করা যায়। আলংকারিক অতিরঞ্জনে সাহিত্যের প্রাণবন্ততা ও সাবলীলতা হোঁচট খেয়ে পড়ে। যার কারণে সাহিত্যের গুণগত মান অর্থগত, শৈলীগত, রূপগত ও কল্পনাগতভাবে নিম্নগামী হয়ে পড়ে (হান্না, ১৯৯১ : ৩ : ৩৮৫-৩৮৬)। লেখকগণ বাক্যকে সমধ্বনি, অন্ত্যমিল ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দের বাহারি সাজে সজ্জিত করতে এত বেশি নিবিষ্ট হন, যা স্বাভাবিক রুচিশীলতার সীমা অতিক্রম করেছে। কবিতা স্বভাবধর্মী প্রতিভার বহিঃপ্রকাশের চেয়ে শাব্দিক কারুশিল্পে পরিণত হয় এবং বাহ্যিক কারুকার্যের অত্যধিক লেপনে এর মর্মগত দিক বিসর্জিত হয়। ফলে এ সময়কার কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মসমূহ আলংকারিক আতিশয্যে ভরপুর হলেও সাহিত্যিক মানদণ্ডে একে শিল্পসম্মত রচনা বলা চলে না।

পতন যুগের সংকটময় ও অস্থিরতাপূর্ণ এই পরিবেশে মানুষের মাঝে দুই ধরনের চেতনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বৈরাগ্যবাদী চেতনা ও নৈরাজ্যবাদী চেতনা। কেউ পার্থিববিমুখ হয়ে পারলৌকিক সুখের প্রত্যাশায় ধর্মানুরাগী হয়ে পড়ে, আবার কেউ পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাসিতায় নিজেকে বিলিয়ে দেয় এবং স্বীয় উন্মত্ততা নির্লজ্জরূপে স্বীয় লেখনীতে প্রকাশ করে (হান্না, তা. বি. : ৮৬০)। অনুরূপভাবে কবিদের মধ্যেও দুই বিপরীতমুখী বিষয় নিয়ে অধিক মাতামাতি লক্ষণীয়। একটি সুফিতত্ত্ব অপরটি অশ্লীলতা। একদল যুদ্ধের ঘনঘটা ও সামাজিক বিপর্যয় হতে মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে নিজেদেরকে সঁপে দেন এবং বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি পেতে প্রয়াস পান। তাঁরা মহাপ্রভুর মহিমা ও তাঁর প্রেরিত রাসুলের স্তুতি গেয়ে কবিতা রচনা করেন। অপরদল হতাশা হতে মুক্তি পেতে এবং মানসিক অশান্তি বিস্মৃত হতে প্রবৃত্তিচারী ও নির্লজ্জ হয়ে পড়েন। তাঁরা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে উপজীব্য করে কাব্যনির্মাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন (বুতরুস, ১৯৮৯খ : ২১৫-২১৬)। এ সময় সৃজনশীলতার অভাবে বহু কবি চৌর্যবৃত্তিরও আশ্রয় নেন (মুহাম্মদ, ১৯৯৯ : ২ : ৬৪৩)।

পতন যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতা, জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও আরব-মানসের ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত ইত্যাকার নেতিবাচক বিষয়গুলো সাহিত্যজগতে চরমভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে সৃষ্টিশীল ও নব উদ্ভাবিত কোন বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে পরিদৃষ্ট হয় না। সাহিত্যের সকল শাখায় বন্ধ্যাত্ব ও মন্দাভাব নেমে আসে। কাব্যক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আব্বাসীয় যুগের নীরস অনুকৃতি ছাড়া নূতন কোন বিষয়ের সংযুক্তি চোখে পড়ে না। সাহিত্যবিদ জুরজি যায়দান পতন যুগের মামলুকি পর্বকে 'কোষ ও সংকলনের যুগ' ('আসরুল মাওসূ'আত ওয়াল মাজামি') এবং 'উছমানি পর্বকে 'ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যুগ' ('আসরুশ্ শারূহ ওয়াল হাওয়াশী) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (জুরজি, তা. বি. : ৩ : ২৯১)। মোটের উপর বলা যায়, মঙ্গোল বাহিনী আরবি সাহিত্যের অনির্বাণ শিখাকে সাময়িক নির্বাপিত করলেও এবং তুর্কি 'উছমানিদের আমলে সাহিত্য মুখ থুবড়ে পড়লেও মামলুকিরা মিশর ও সিরিয়ায় সফল তৎপরতার মাধ্যমে এর নিভুনিভু দীপ্তিকে সুরক্ষা করেছে।

৬. আধুনিক যুগ (১৭৯৮ খ্রি./১২১৩ হি.-বর্তমান)

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) মিশর আক্রমণ করেন। নেপোলিয়নের আক্রমণ মিশরের জন্য প্রচণ্ড নাড়াস্বরূপ। এই নাড়া মিশরবাসীকে তাদের সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত করেছিল। তারা উপলব্ধি করল, পৃথিবী এগিয়ে চলছে অথচ তারা ভিন্ন জগতে বসবাস করছে এবং অতীত স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। নেপোলিয়নই মিশরের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন। তাঁর পরিচালিত মাত্র তিন বছরের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক রূপরেখার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক মিশর তার অগ্রযাত্রা আরম্ভ করেছিল ('উমার, ১৯৭৩ : ১ : ২৩-২৪)। এই আক্রমণের রাজনৈতিক ফলাফল যাই হোক না কেন, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক। কেননা তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন এমন এক বিদ্বৎসমাজকে যাঁরা মিশরে সভ্যতার বীজবপনে প্রভূত অবদান রেখেছিলেন। তাঁরা দুটি শিক্ষালয়, দুটি সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য একটি থিয়েটার নির্মাণ করেন। পাশাপাশি গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, বিজ্ঞান একাডেমি, রসায়নাগার ও মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এতে মিশরীয়রা অন্ধকারে জ্যোতির ছটা দেখতে লাগল (আহমাদ, ২০০০ : ৩০৭)।

ক্রুসেড যুদ্ধ ও ভিনদেশি তুর্কি শাসনের নাগপাশে আরবরা সুদীর্ঘকাল অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল। জাতীয়, অর্থনৈতিক, মনোজাগতিক সব দিক থেকেই তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ল। প্রাচ্যের আরবদের যখন এই হৃতসর্বস্ব অবস্থা তখন পশ্চিমা ইউরোপীয়রা উন্নতির চরম শিখরে। তাদের প্রজ্বলিত জ্ঞানবিজ্ঞানের মশাল তখন সারা পৃথিবীকে আলোকিত করছিল। তবে আব্বাসীয় যুগে এই মশাল ছিল আরবদেরই কব্জায়। সে সময় আরবদের ধার করা জ্ঞান নিয়েই ইউরোপীয়রা আলোর দিশা লাভ করেছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আধুনিক যুগে এসে সেই আরবকে জ্ঞান ও সাহিত্যভাণ্ডারের জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হতে হল (হান্না, তা. বি. : ৮৮৪-৮৮৫)। ইউরোপীয়দের সাথে আরবদের যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ায় আধুনিক যুগের আরবি সাহিত্যে নবদিগন্ত সূচিত হয়। প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিথস্ক্রিয়া ও সংশ্লেষণের ফলে আরব বিশ্বে আধুনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেই সাথে পশ্চিমা গবেষকগণ প্রাচ্যদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। এ সবের কারণে আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ঘটে। যে-সব অনুঘটক আধুনিক যুগের সাহিত্যাঙ্গনে পুনর্জাগরণের ভিত রচনা করেছিল নিচে তা উল্লেখ করা হল।

৬.১. সাহিত্যে পুনর্জাগরণের অনুঘটকসমূহ

৬.১.১. শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা : জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি ও সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। লেবাননে প্রাক-আধুনিক যুগ হতেই শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার শুভসূচনা হয়। সেখানে দেশীয় শিক্ষালয়ের পাশাপাশি বহু বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ও খ্রিষ্টান ইউনিভার্সিটি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইতোমধ্যে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের প্রসারে ভূমিকা রাখলেও তা ধর্মীয় ও ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন

সাধিত হয়। আল-আযহারের পাঠ্যসূচি আধুনিকায়ন করে এর শিক্ষা কাঠামোকে তিন স্তরে বিভক্ত করা হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। পরবর্তীকালে আল-আযহারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও বিশেষায়িত শিক্ষার জন্য ইউরোপে প্রেরণ করা হয় (প্রাগুক্ত, ৯০৩-৯০৬)। সাহিত্যে আধুনিকতার হাওয়া বয়ে আনতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া নব্যশিক্ষিতদের ভূমিকা মোটেও গৌণ নয়।

৬.১.২. মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা : শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাকার বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মুদ্রণযন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালিতে সর্বপ্রথম আরবি মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তন ঘটে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই মূলত লেবানন ও সিরিয়ায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার ঘটে, আর এতে প্রাচীন আরবি অভিধান, সাহিত্য ও কোষজাতীয় গ্রন্থসমূহ মুদ্রণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সময় *লিসানুল 'আরব, কিতাবুল 'আগানী, আল-'ইকদুল ফারিদ, সুবহুল 'আ'শা*-এর মত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলি এবং জাহিলি যুগের আরবি কবিতার দুর্লভ দিওয়ানসমগ্র মুদ্রিত হতে থাকে (আহমদ, তা. বি. : ৩২২-৩২৩)। এসব গ্রন্থ মুদ্রণের ফলে প্রাচীন আরবি সাহিত্য নূতনরূপে পঠনপাঠন ও অধ্যয়ন-গবেষণার সুযোগ অবারিত হয় এবং টীকাটিপ্পনী সহ বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থগুলো সম্পাদিত হয়ে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। আসলে যে কোন ভাষার সাহিত্যে আধুনিকতা ও নতুনত্বের আমদানি ঘটে তার অতীত সাহিত্যের উপর ভিত্তি করেই। সুতরাং মুদ্রণশিল্প যে আরবি সাহিত্যাঙ্গনে নবচেতনা সৃষ্টি করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

৬.১.৩. সংবাদপত্র প্রকাশ : সংবাদপত্র হচ্ছে একটি দেশের ভ্রাম্যমাণ শিক্ষালয়, যার অবস্থান কোন নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। জ্ঞান ও শিক্ষার সকল শাখায় তা আবর্তিত হয়। এটি সংবাদ, তথ্য, ইতিহাস ও যুগের দিনপঞ্জিকা। সংবাদপত্র একটি জাতির অবস্থানগত দূরত্ব কমিয়ে দেয় এবং তাদের মনন ও বিবেককে শাণিত করে (আহমদ, তা. বি. : ৩১৫)। আরব বিশ্বে মুদ্রণশিল্প বিকাশের ফলে সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আরবি সংবাদপত্রের প্রথম সূতিকাগার হচ্ছে মিশর। ১৮২৮ খ্রি. *আল-ওয়াকা'ই' আল-মিসরিয়্যাহ* (মিশরীয় ঘটনাবলি) নামে প্রথম আরবি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সপ্তাহে এর তিনটি সংখ্যা বের হত। শুরুর দিকে তুর্কি, ফরাসি ও আরবি এই তিন ভাষার সংস্করণ প্রকাশ করা হত। পরবর্তীকালে রিফা'আ বেক আত-তাহতাভির (১৮০১-১৮৭৩ খ্রি.) তত্ত্বাবধানে কেবল আরবিতেই এটি প্রকাশিত হতে থাকে (হান্না, তা. বি. : ৯০৯-৯১০; আহমদ, তা. বি. : ৩২৩)। ১৮৫৮ খ্রি. *'হাদিকাতুল আখবার'* (সংবাদ উদ্যান) নামে সিরিয়া হতে আরো একটি আরবি পত্রিকা প্রকাশলাভ করে। এর পর পর মিশর হতে বিপুল পরিমাণে নানা সংবাদপত্র ও বিচিত্র সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- *আল-আহরাম* (১৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুকতাতাফ* (১৮৭৬), *আল-মুয়াইয়িদ* (১৮৮৯), *আল-হিলাল* (১৮৯২) ইত্যাদি (হান্না, তা. বি.: ৯১২-৯১৩)। যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টিতে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া আরবদের মাঝে ব্যক্তিস্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ আনয়নে এসব সংবাদপত্র সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল। সংবাদপত্রের সহজবোধ্য ভাষা আঞ্চলিক ও প্রমিত (আল-ফুসহা) ভাষার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। ফলে আরবি ভাষা অধিকতর কোমলতা ও সাবলীলতা

লাভ করে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আবেগ ও মনোভাব প্রকাশে সক্ষমতা অর্জন করে (প্রাগুক্ত, ৯১৩)। এতে সাহিত্যের ভাব-পরিধি যেমন বিস্তৃতি লাভ করে তেমনি এর নব নব শাখারও উদ্ভব ঘটে।

৬.১.৪. বিজ্ঞান একাডেমি ও সাহিত্যসংস্থা গঠন : নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের পর আরব ভূখণ্ডে আধুনিকতার হাওয়া বয়ে চলে। এতে প্রভাবিত হয়ে আরবের বোদ্ধামহল জোটবদ্ধ হয়ে নানা সংস্থা গড়ে তোলে। এসব সংস্থা আরব বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজকে একই মঞ্চে সংগঠিত করার প্রয়াস পায় এবং তাদের মতামত ও চিন্তাধারা যাতে সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে তজ্জন্য সচেষ্ট হয়। নাসিফ আল-য়াযিজি (১৮০০-১৮৭১ খ্রি.) ও বুতরুস আল-বুস্তানির (১৮১৯-১৮৮৩ খ্রি.) মত উঁচু মাপের চিন্তাবিদ ও লেখকগণ এ ধরনের সংস্থা গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। নবগঠিত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈরুতে প্রতিষ্ঠিত 'সিরিয়া বিজ্ঞান একাডেমি' (আল-জাম'ইয়্যাতুল 'ইলমিয়্যাহ আস-সূরিয়্যাহ), প্রাচ্যদেশীয় বিজ্ঞানসংস্থা (আল-মাজমা' আল-'ইলমি আশ-শারকি) এবং দামিস্কে প্রতিষ্ঠিত 'আরবীয় বিজ্ঞান সংস্থা' (আল-মাজমা' আল-'ইলমি আল-'আরবি) অন্যতম। এসব সংস্থা তাদের মুখপাত্র হিসেবে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাবলির পাশাপাশি সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করে (প্রাগুক্ত, ৯১৪-৯১৫)। এতে বিজ্ঞানমনস্ক জনসমষ্টি সৃষ্টিতে যেমন এগুলো অবদান রাখে, তেমনি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে ও উৎকর্ষ সাধনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে।

৬.১.৫. প্রাচ্যসম্বন্ধীয় গবেষণা : Orientalism তথা পশ্চিমা ইউরোপীয়দের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যযুগে ইউরোপীয়রা ধর্মীয় মিশনারি প্রচারপ্রসারের লক্ষ্যে এবং তাওরাত পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যদেশীয় সেমেটিক ভাষাসমূহ তথা আরবি, সুরিয়ানি ও হিব্রু ভাষার প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রাচ্যে তাদের উপনিবেশ পাকাপোক্ত করার মানসে এবং শাসনকার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করার স্বার্থে প্রাচ্যদেশীয় ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। তখন তারা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র মতো নানা প্রতিষ্ঠান আরব ভূখণ্ডে গড়ে তোলে (প্রাগুক্ত, ৯২০)। উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশিত *'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল'* জ্ঞান ও সাহিত্যের আকর হিসেবে বিবেচিত। প্রাচ্যবিদগণ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করে তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে এর পেছনে নিবিড় গবেষণায় অভিনিবিষ্ট হন। তাঁরা অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আরবি সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পাঠোদ্ধার, গ্রন্থনা ও সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। পাঠকবর্গের কাছে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে তাঁরা ইউরোপীয় গ্রন্থাবলির আদলে বহু আরবি পুস্তকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমেত সূচিপত্র ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে তা পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করেন। বাস্তবেই আরব উপদ্বীপে প্রাচ্যবিদদের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে আরব ইতিহাস ও সাহিত্যের বহু অনুদ্ঘাটিত বিষয় উন্মোচিত হয়েছে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে তাঁরা বহু গ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করেন। বর্তমানে পদ্ধতিগত ও সুবিন্যস্ত রূপে আরবি সাহিত্যের যে ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হয়েছি তা তাঁদেরই গবেষণা-পর্যালোচনার

ফসল বলতে হবে ('উমার, ১৯৭৩ : ১ : ৪৮৫; হান্না, তা. বি. : ৯২০-৯২১)। সাহিত্যের ময়দানে পুনর্জাগরণের উপর্যুক্ত অনুঘটকসমূহ সাহিত্যের দুই শাখা কাব্য ও গদ্য উভয়কে সমভাবে প্রভাবিত করেছে। নিম্নে উভয় শাখার যুগধর্ম নিয়ে পৃথক আলোচনা করা হল।

৬.২. আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্য

আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বটা কবিতার আকাল বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা কবিতা পুরোটাই নান্দনিক শিল্পের উপর নির্ভরশীল। আরবি কবিতায় এই নান্দনিকতার আগমন ঘটে আরব বুদ্ধিবৃত্তির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে। আর এটি ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক স্তর পেরিয়ে পূর্ণতালাভ করতে যথেষ্ট সময় লাগে। যার ফলে গদ্যের চেয়ে পদ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে একটু দেরিতে এবং কয়েক পর্ব অতিক্রম করেই কাব্যসাহিত্য পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। কাব্যসাহিত্যের অগ্রগতির এই ধারাকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

৬.২.১. অনুকরণ পর্ব;
৬.২.২. সংস্কার পর্ব।

৬.২.১. অনুকরণ পর্ব : রেনেসাঁ পর্বের প্রথম দিকে কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবদের জাতীয় ও ঐতিহ্যচেতনায় উজ্জীবিত করা। এ ক্ষেত্রে কবিগণ প্রাচীন আরব কবিদের অনুসৃত ধারা অনুসরণ করে অতীত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেন। তাঁরা অতীতের কোন এক কবিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর রচনাশৈলী, ভাব, বিষয়বস্তু ইত্যাদি অনুকরণ করে কাব্য রচনার প্রয়াস পান। এ পর্বে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, আর্থসামাজিক অবস্থা ও সমকালীন পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় (হান্না, তা. বি. : ৯২৫-৯২৬)। তবে এ ধারার অনুকরণপ্রিয় কবিগণ প্রাচীন রচনারীতি ও বয়ানভঙ্গির সৌকুমার্য ও লালিত্য যেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তেমনি তাঁদের কবিতায় নিজের স্বকীয়তা এবং স্বজাতির গৌরব ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁরা আরবি কবিতার হারানো মর্যাদা ও অতীত-গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। শায়খ নাসিফ আল-য়াযিজী (১৮০০-১৮৭১ খ্রি.), ইব্রাহিম আল-আহদাব (১৮২৬-১৮৯১ খ্রি.), মাহমূদ সামি আল-বারূদি (১৮৩৮-১৯০৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিগোষ্ঠী আলোচ্য পর্বের কবি হিসেবে গণ্য।

৬.২.২. সংস্কার পর্ব : পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার সুবাদে প্রাচ্যবাসীরা পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির রসাস্বাদন করতে লাগল এবং নিজেদের সাহিত্যিক দৈন্য ও পশ্চাৎমুখিতা উপলব্ধি করতে পারল। তারা বুঝতে পারল, সাহিত্যই যুগদর্পণ এবং এতে বাস্তব জগৎ ও জনজীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়া চাই। অতীতের চর্বিতচর্বণ সার্থক ও মানসম্মত সাহিত্য হতে পারে না (প্রাগুক্ত, ৯২৬)। সংস্কার পর্বের কবিদের আমরা তিন ধারায় বিভক্ত করতে পারি।

৬.২.২.১. সনাতন ধারা;
৬.২.২.২. নব্যধারা;
৬.২.২.৩. সৃজনশীলধারা।

৬.২.২.১. সনাতন ধারা: সনাতন ধারার কবিগণ কাব্যাঙ্গনে বিষয়গত ও রূপগতভাবে নানা সংস্কারসাধন করলেও তাঁরা আরবি সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে একেবারে বিসর্জন দেন নি। বরং আরবি কবিতার প্রাচীন কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই তাঁরা কাব্য ক্ষেত্রে নতুনত্বের আমদানি করেন। তাঁদের মতে, প্রাচীন সাহিত্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আধুনিক সাহিত্য রচিত হতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যের অবয়ব ও ভাবসম্পদকে অক্ষুণ্ন রেখে তার সাথে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রূপ-রস-গন্ধ ও শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা কাব্য রচনায় প্রয়াসী হন। এ ধারার কবিগণ প্রাচীন আরবীয় কাঠামোকে সযত্নে সুরক্ষা করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শৈল্পিক রীতিনীতি হতে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন। আলোচ্য ধারার প্রতিনিধিত্বশীল কবির মধ্যে রয়েছেন আহমাদ শাওকি (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), হাফিজ ইব্রাহিম (১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.), মারূফ আর-রুসাফি (১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.), খলিল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) প্রমুখ (প্রাগুক্ত, ৯২৬)।

৬.২.২.২. নব্যধারা : সনাতন ধারার পাশাপাশি বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নব্যধারা সৃষ্টিলাভ করে। নব্যধারার পতাকাবাহীদের উপর পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষণীয়। আরবীয় সংস্কৃতির চেয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব তাঁদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে বেশি। স্বদেশির চেয়ে বিদেশি ভাবধারা লালনে তাঁরা অধিক তৎপর ছিলেন। ফলত তাঁদের কবিতায় পাশ্চাত্য কবিদের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও চিত্রকল্প অতিমাত্রায় রূপায়িত হয়েছে। মূলত এই নব্যপন্থীরাই আরবি কবিতায় পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতা আমদানি করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁরা পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে এত বেশি সীমালঙ্ঘন করেন যে, তাঁরা নিজস্ব আরবীয় ঐতিহ্যিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে যেন পশ্চিমা কবিতাকেই অনুবাদ করছেন (প্রাগুক্ত, ৯২৭)। যাকে সমালোচকগণ 'স্বকীয়তাবিহীন নির্জীব সাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বপরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন সাহিত্য কখনোই অর্থবহ ও প্রাণবন্ত সাহিত্য হতে পারে না। যার ফলে এ ধারার সাহিত্য জনসমাদৃত যেমন হয় নি তেমনি স্থায়িত্ব লাভও করতে পারে নি। তবে এটা ঠিক যে, নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী উভয় দলের শৈল্পিক চেতনায় ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টায় আরবি কবিতা কালক্রমে প্রাচীন রীতির খোলস ছেড়ে নবসাজে সুসজ্জিত হয় এবং নূতন ভাবধারায় সুসমৃদ্ধ হয়ে নবরূপে রূপায়িত হয় (মুহাম্মদ, ১৯৯২ : ১৭২)। নব্যপন্থীদের সার্থক মুখপাত্র হচ্ছেন জিবরান খালিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১ খ্রি.) ও বিশ্র ফারিস (১৯০৭-১৯৬৩ খ্রি.), আর এ ধারার লীলাভূমি হচ্ছে লেবানন ও প্রবাসী কবিদের আবাসস্থল (হান্না, তা. বি. : ৯২৭)। নব্যপন্থীদের মধ্যে আরো যাঁদের নাম নেয়া যায়, তাঁরা হচ্ছেন 'আব্দুর রহমান শুক্‌রি (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি.), ইব্রাহিম আল-মাযিনি (১৮৮৯-১৯৪৯ খ্রি.), 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) প্রমুখ।

৬.২.২.৩. সৃজনশীলধারা : উপর্যুক্ত নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী বিপরীতমুখী দুই ধারার মাঝে সমন্বয়ধর্মী তৃতীয় এক নূতন ধারা সৃষ্টিলাভ করে যেটি কবিতাকে বিশুদ্ধ শিল্পের দিকে পরিচালিত করেছে। এটাকে আমরা 'সৃজনশীল ধারা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। এ ধারার কবিগণ কবিতাকে অভিসারের বর্ণনা ও সৌজন্যের প্রশংসায় যেমন গণ্ডিবদ্ধ রাখেন নি, তেমনি অতীতের অন্ধ অনুকরণ কিংবা ভাষাগত ওজস্বিতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেন

নি। তাঁরা সাহিত্যকে সামাজিক কাঠামো ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর পরিপূর্ণরূপে দাঁড় করানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁরা আধুনিক পরিবেশে ঐতিহ্যগত রূপকল্প ও সমকালীন ভাবধারার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এ ধারার অগ্রদূতদের মধ্যে রয়েছেন আমিন নাখলা (১৯০১-১৯৭৬ খ্রি.), ইলয়াস আবু শাবকা (১৯০৪-১৯৪৭ খ্রি.), আহমাদ যাকি আবূ শাদি (১৮৯২-১৯৫৫ খ্রি.) প্রমুখ (প্রাগুক্ত, ৯২৮)।

আসলে কাব্যের বিষয়বস্তু ও শৈল্পিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বে কবিতা অতীতের গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় সভ্যতা ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে প্রাচ্য জনসাধারণের মাঝে আত্মসচেতনতা ও স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ফলে গণমানুষের দুঃখদুর্দশাসহ নানা সামাজিক ব্যাধিনির্ভর কবিতা লেখা আরম্ভ হয়। জাতির সুখদুঃখ ও নানা সামাজিক অসংগতির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে কবিতা রচিত হয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত সহায়হীন মানুষের বেদনা ও হাহাকার কাব্যিক ছন্দে অনুরণিত হয়। পাশাপাশি সৃজনশীল নব নব বিষয়বস্তু ও নবাবিষ্কৃত উপজীব্য কবিদের কাব্যে উপস্থাপিত হয় (প্রাগুক্ত, ৯২৮-৯২৯)। আধুনিক আরবি কাব্যাঙ্গনে শৈল্পিক অভিব্যক্তির চরমরূপ লক্ষ করা যায় নাট্যকাব্য, আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য সৃষ্টিতে। নাট্যকাব্যে আহমাদ শাওকি, আখ্যানকাব্যে খলিল মুতরান (১৮৭১-১৯৪৯ খ্রি.) এবং মহাকাব্যে আহমাদ মুহার্‌রাম (১৮৭৭-১৯৪৫ খ্রি.) কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। আহমাদ মুহার্‌রামের *নবী-চরিত* (আস-সীরাতুন নাবাভিয়্যাহ) 'ইসলামিক ইলিয়ড' নামে পরিচিত (না'মাত, তা. বি. : ৬৭)। অবশ্য রূপতাত্ত্বিক কাঠামোর দিক থেকে অধিকাংশ কবি পূর্বতন প্রচলিত ছন্দেই কাব্য নির্মাণ করেন। যদিও নব্যধারার কেউ কেউ মুক্ত ছন্দে গদ্য কবিতা সৃষ্টির প্রয়াস চালান (হান্না, তা. বি. : ৯২৯)। এভাবে কবিতা অতীতের ঐতিহ্যকে লালন করে নতুন যুগের নতুন সৃষ্টিকে আহরণ করে নবচেতনায় ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে।

৬.৩. আধুনিক যুগের গদ্যসাহিত্য

আধুনিক যুগে কাব্যসাহিত্যের বিকাশের চেয়ে গদ্যের বিকাশ কিছুটা বিস্তৃত ও গভীরতর। কেননা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে ছন্দের বেড়াজালে আবদ্ধ পদ্যের চেয়ে গদ্য বেশি উপযোগী ও অনায়াসী। তাছাড়া আধুনিক যুগে সংবাদপত্রের প্রসারের ফলে গদ্যসাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত হয়। বিশেষত অতীতের ছন্দোবদ্ধ ও অনাবশ্যক অলংকরণ হতে আধুনিক গদ্য মুক্তিলাভ করে। বক্তৃতা (খুতবা), উপদেশমালা (ওয়াসায়া), প্রবাদপ্রবচন (মাছাল), নীতিকথা (হিকমা) ইত্যাকার গতানুগতিক বিষয়ের চর্বিতচর্বণ হতে বেরিয়ে জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়কে উপজীব্য করে গদ্য রচনা আরম্ভ হয়। তবে কবিতার ন্যায় এই গদ্যও উৎকর্ষলাভ করতে এবং কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত হতে কয়েক স্তর অতিক্রম করতে হয়। আধুনিক যুগের গদ্যসাহিত্যকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি।

৬.৩.১. প্রারম্ভিক পর্ব (১৭৯৮-১৮৫০ খ্রি.);
৬.৩.২. প্রস্তুতি পর্ব (১৮৫০-১৯০০);
৬.৩.৩. বিকাশ পর্ব (১৯০০-বর্তমান)।

৬.৩.১. প্রারম্ভিক পর্ব (১৭৯৮-১৮৫০ খ্রি.) : নেপোলিয়নের মিশর দখলের পর সেখানে নতুন জীবনবোধের উন্মেষ ঘটলেও সাহিত্যাঙ্গনে নতুনত্বের আমেজ আসতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। যে-কারণে আরবি গদ্যরীতি 'উছমানি আমলের রীতিনীতির গণ্ডি পেরিয়ে আসতে যেমন কিছুটা সময় লাগে তেমনি সাহিত্যে জীবনবোধের উপলব্ধিও আসে আরো পরে (হাফেজ, ১৯৯২ : ১২৭)। মুহাম্মাদ 'আলির শাসনকালে (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) মিশরে সাহিত্যিক জাগরণের চেয়ে বৈজ্ঞানিক জাগরণ ঘটেছে বেশি। তিনি ভাবলেন, জাতীয় উন্নয়নে সাহিত্যের চেয়ে জ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বেশি। তাছাড়া শুরুতে তিনি আরবি ভাষার চেয়ে তুর্কি ভাষাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন ('উমার, ১৯৭৬: ৭)। এতে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেও আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বে আরবি সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। ফলে আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্বে গদ্য রচনা পতন যুগের ন্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্গসজ্জা ও আলংকারিক বাহুল্যনির্ভর ছিল। অর্থগত ও অন্তর্নিহিত ভাবের চেয়ে শব্দগত ও রূপগত পরিচর্যার দিকে লেখকগণ মনোযোগী হন বেশি। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গঠনগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে সাহিত্যনির্মাতাগণ অন্ত্যমিল ও অলংকারের বিচিত্র দিক নিয়ে ভাবতে থাকেন এবং একই অর্থকে নানা ভঙ্গিমায় বহু বাক্যে প্রকাশ করেন (হান্না, তা. বি. : ৯৩১)। আর এতে রূপসজ্জার বাগাড়ম্বরে সাহিত্যের সৃজনশীল মান যেমন ক্ষুণ্ন হয় তেমনি অর্থগতভাবে ঐ রচনা নীরস ও অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য হয়। এ পর্বের লেখকগণ গদ্যসাহিত্যকে মানগত দিক থেকে পতন যুগের পশ্চাৎপদ সাহিত্য হতে উত্তরণ ঘটাতে খুব একটা সফল হন নি বলেই মনে হয়। তবে তাঁরা রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে আরবি সাহিত্যের ঐতিহ্যিক রীতি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। প্রারম্ভিক পর্বের লেখকদের সার্থক প্রতিনিধি হচ্ছেন নাসিফ আল-য়াযিজি, নাস্‌র আল-হুজিনি (মৃ. ১৮৭৪ খ্রি.), 'আলি পাশা মুবারাক (১৮২৩-১৮৯৩ খ্রি.) প্রমুখ।

৬.৩.২. প্রস্তুতি পর্ব (১৮৫০-১৯০০) : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে পাশ্চাত্যের সাথে আরবের মিথস্ক্রিয়া পাকাপোক্ত হয় এবং আরবরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ফল্গুধারা আহরণ করতে থাকে। উক্ত শতাব্দীর প্রথমার্ধে চর্চিত নবজ্ঞান জনজীবনে প্রভাব বিস্তারের পর দ্বিতীয়ার্ধে এসে সাহিত্যশিল্পে প্রভাব ফেলতে থাকে। এ সময় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠাসহ নানা গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের প্রকাশনা বেড়ে যায়। ফলে আরবি গদ্যে পাশ্চাত্য কলাকৌশল ও বৈশ্বিক শিল্পসৌন্দর্য আমদানি হতে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাহিত্য আহরণের ক্ষেত্রে প্রাচ্য আরবে রক্ষণশীল এবং সংস্কারবাদীদের মাঝে বিতর্ক ও শোরগোল পড়ে যায়। তবে পরিশেষে সংস্কারবাদীদেরই বিজয় সূচিত হয়। তাঁরা মনে করেন, প্রাচীন আরবীয় রীতিনীতি আধুনিক জীবনের সামষ্টিক দিক পূর্ণরূপে চিত্রায়ণ করতে সক্ষম নয় (প্রাগুক্ত, ৯৩১-৯৩২)। সাহিত্যে জীবনধর্মী আবহ সৃষ্টি করতে পাশ্চাত্য ভাবধারা লালন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাঁরা। জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আনন্দ বেদনা ইত্যাদি সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য এ সময়কার গদ্যশিল্পীগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান এবং সাহিত্যকে বাস্তবধর্মী ও জীবনমুখী করতে প্রয়াসী হন। তাঁরা আরবি সাহিত্যকে অধুনা

সমাজচেতনা এবং আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে নেন। প্রস্তুতি পর্বের পথিকৃৎ যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন ইব্রাহিম আল-আহদাব (১৮২৬-১৮৯১ খ্রি.), জামাল উদ্দিন আল-'আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৮ খ্রি.), মুহাম্মাদ 'আব্দুহ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.), ইব্রাহিম আল-য়াযিজি (১৮৪৭-১৯০৬ খ্রি.), মুহাম্মাদ আল-মুওয়ায়লিহি (১৮৬৮-১৯৩০ খ্রি.) প্রমুখ।

৬.৩.৩. বিকাশ পর্ব (১৯০০-বর্তমান): বিংশ শতাব্দীর আগমনের সাথে সাথে আরবি সাহিত্যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রাচ্যের গণমানুষের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করে; এমনকি পাশ্চাত্য সাহিত্যশিল্প পঠন-পাঠনে তারা কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং এতে গভীরতা লাভ করে। ফলে পাশ্চাত্য-গদ্যের বিচিত্র শাখা নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা সাহিত্য ইত্যাদি আরবি ভাষায়ও পত্রপল্লবিত হতে থাকে। নতুন অর্থ সৃষ্টিতে তদুপযোগী নব নব শব্দেরও আমদানি ঘটে। অর্থ আদায়ে গতানুগতিক সনাতন রীতি পরিহার করে নতুন রীতি ও কলাকৌশলের প্রয়োগ ঘটে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাচীন ধারার উপর নব্যধারা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এরই মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকৃত রেনেসাঁর পর্ব শুরু হয় (প্রাগুক্ত, ৯৩২)। ত্বাহা হুসায়ন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.), মাহমুদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খ্রি.), তাওফিক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.), নাজিব মাহফূয (১৯১১-২০০৬ খ্রি.) প্রমুখ গদ্যশিল্পীদের হাতে আধুনিক যুগের আরবি সাহিত্য চরম বিকাশ লাভ করে।

সত্যি বলতে কি, আধুনিক যুগের প্রথম শতাব্দীতে (১৯ শতকে) সাহিত্যে যে জাগরণ ঘটে তা নবজন্ম কিংবা নবজাগরণ নয়; বরং এটি অতীত সমৃদ্ধ সাহিত্যের পুনর্জাগরণ, যা 'উছমানী বা পতন যুগে বিলুপ্তির মুখে পড়েছিল। ফলে উনিশ শতকের সাহিত্যে বিশেষত কাব্য সাহিত্যে জাহিলি, ইসলামি ও আব্বাসীয় কবিদের অনুকৃতি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয় (শাওকি, তা. বি.খ : ৫১৩)। উক্ত শতকের সাহিত্যিকগণ ক্লাসিক্যাল মডেল দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, পূর্ববর্তী শতাব্দীসমূহে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যে স্থবিরতা বিরাজ করছিল তা দূরীকরণ এবং ক্লাসিক্যাল সাহিত্যকলার ঐতিহ্যের সংরক্ষণ (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯৮৬ : ২ : ৫৪৮)। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, উনিশ শতক ছিল আরবি সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুকৃতির কাল। বিশ শতকেই মূলত নতুন আঙ্গিকে মৌলিক আধুনিক আরবি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বিশ শতকের আরবি সাহিত্যে জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক পরিচ্ছন্নরূপে উপস্থাপিত হয় এবং জীবনের সকল দিক নৈপুণ্যের সাথে বিশ্লেষিত হয়। এই শতকের সাহিত্যশিল্পীগণ নিছক অনুকরণমুখী না হয়ে প্রাচীন আরবি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা উভয়টিকে পরিমিতরূপে গ্রহণ-বর্জন করে আরবি সাহিত্যের নবধারায় বহুমাত্রিকতা আনয়ন করেন।

উপসংহার

কালিক প্রভাব ও সৃষ্টিধর্মকে বিবেচনায় এনে আমরা সাহিত্যের উপর্যুক্ত যুগবিভাগ ও শ্রেণিবিভাজন করেছি। সাহিত্যে বহির্জাগতিক প্রভাবও এতে আমলে নেয়া হয়েছে। পৃথিবীর অপরাপর ভাষার সাহিত্যের ন্যায় আরবি সাহিত্যেও যুগযুগান্তরে বহুবিধ রূপান্তর

ঘটেছে। আরবি সাহিত্যের কালগত ইতিহাসে কবিদের যুগ-মানস আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যবিদ ও ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত বলেন, "জাহিলি কবি গোত্রীয় প্রতিরক্ষার মুখপাত্র, মানমর্যাদার রক্ষাকবচ ও সুকীর্তির রেজিস্ট্রার। উমাইয়া কবি ধর্মীয় প্রবক্তা, রাজশক্তির খুঁটি এবং নানা মতবাদ ও দলাদলির পরিপোষক। আর আব্বাসীয় কবি খলিফার নিত্যসহচর, সভাসদের সদস্য ও রূপসী নারীর প্রেমাসক্ত" (আহমাদ, ২০০০ : ১৯১)। এর সাথে যোগ করে আমরা বলতে পারি, পতন যুগের কবি নির্জীব ও সৃষ্টিহীন বাগাড়ম্বরকারী এবং অলংকরণের আতিশয্যে আড়ষ্ট। সর্বোপরি আধুনিক যুগে এসে একজন কবি পরিবেশানুগ সমাজচিন্তক, নিপুণ যুগচিত্রকর ও মানববোধে উদ্দীপ্ত সমাজশিল্পীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ।

জাহিলি যুগের সাহিত্য ছিল স্থানগত ও কালগত পরিবেশ পরিস্থিতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। বেদুইন আরবের গোত্রীয় উদ্যম ও স্বভাবজাত প্রবণতা এতে সুপ্রতিভাত হয়েছে। গোষ্ঠীগত অহমিকা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তৎকালীন কবিদের কবিতায় উজ্জ্বলরূপে পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অধিকাংশ কবিসাহিত্যিকের মাঝে জাহিলি ভাবধারার অনুবর্তন লক্ষ করা যায়। অবশ্য মুসলিম সাহিত্যিকদের আদর্শিক পরিবর্তন তাঁদের রচনাবলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু ইসলাম-স্বীকৃত বিষয় দ্বারা যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তেমনি এর শৈল্পিক রীতি পবিত্র কুরআন ও হাদিছের রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। উমাইয়া যুগের আগমনে মানুষের গোত্রীয় চেতনা ও ব্যক্তিক তাড়না রাজনৈতিক ও দলগত ভাবনায় পরিণত হয়। এতে সাহিত্যও দলীয় ও রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত হয়; পরিণতিতে উমাইয়া সাহিত্যে জাহিলি সাহিত্যের রূপ-রস-গন্ধের প্রত্যাগমন ঘটে। উমাইয়া সাহিত্যকে জাহিলি সাহিত্যের বিকশিত রূপ ও নবসংস্করণ বলা চলে। আব্বাসীয় যুগে এসে আরবি সাহিত্য বিশ্বসভ্যতার ছোঁয়ায় নবরূপে সুসজ্জিত হয়। বৈশ্বিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে আরবি সাহিত্যশিল্প ধূসর মরু হতে মুখ ফিরিয়ে নগরাভিমুখী হয়। নগরজীবনের বিলাসবৈভব এবং বহির্জগতের মিথস্ক্রিয়ায় আব্বাসীয় সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মঙ্গোলিয়ানদের আরব আক্রমণ আব্বাসীয় যুগে প্রজ্বলিত আরবি সাহিত্যের অনির্বাণ শিখা নির্বাপিত করে দেয়। ফলে সাহিত্যের অধোগতি ও পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পতন যুগে ভাগ্যবিড়ম্বিত ও দুর্দশাগ্রস্ত আরব সাহিত্যিকদের মাঝে সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তে প্রাণহীন অতিরঞ্জন ও শ্রীহীন প্রসাধন লক্ষ করা যায়, যা শিল্পসুষমাহীন নীরস সাহিত্যের জন্ম দেয়। অবশ্য সৃজনশীলতার অভাবে নীরস সাহিত্যের মাঝেও এ সময় অতীতের সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার সংগ্রহ ও বিন্যাসকরণে বেশ কিছু কোষ জাতীয় রচনা গ্রন্থিত হয়। অবশেষে ফরাসী সমরনায়ক নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণে ঘুমন্ত আরবদের চৈতন্যোদয় ঘটে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা আরব-মানসকে প্রচণ্ডরূপে নাড়া দেয়। ফলে আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁর যুগ আরম্ভ হয় এবং এতে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি জীবনবোধ ও মানববোধের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়, যা সমকালীন সাহিত্যশিল্পীদের লেখনীতে সার্থকরূপে চিত্রায়িত হয়েছে। একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে নাজিব মাহ্‌ফুজের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রমাণ করে, আরবি সাহিত্য দেশ-কাল-ভাষার সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বমানের সাহিত্যে

উন্নীত হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাহিত্য আজ কেবল আরববাসী কিংবা আরবিভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলেই বহুলপঠিত ও জননন্দিত তাই নয়; বরং বিশ্বদরবারেও সমভাবে সুখ্যাত ও সমাদৃত।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আবদুল গফুর চৌধুরী (১৯৮২)। *আরবী গদ্য সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। কিতাব ঘর, চট্টগ্রাম।

আল-জাহিয (১৯৬৯)। *কিতাবুল হায়াওয়ান*, ১ম খণ্ড। 'আব্দুস সালাম হারুন সম্পা., ৩য় সং, দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবি, বৈরুত।

আহমদ আলী (২০০৪)। *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড। আল-'আকিব প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

আহমদ ইব্ন ইব্রাহিম আল-হাশেমি (১৯৯৯)। *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড। সংশোধিত ১ম নতুন সং, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরুত।

আহমদ আল-'ইসকান্দি ও মোস্তফা 'আনানি (তা. বি.)। *আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহী*। ১৮শ সং, দারুল মা'আরিফা, মিশর।

আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত (২০০০)। *তারিখুল 'আদাবিল 'আরাবি*। ৬ষ্ঠ সং, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।

আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন (১৯৮৬)। *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*। ১ম সং, ২য় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

ইব্ন কুতায়বা (১৯৬৬)। *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'* ১ম খণ্ড। আহমদ মুহাম্মদ শাকির সম্পা., ২য় সং, দারুল মা'আরিফ, মিশর।

উমার আদ-দাসূকি (১৯৭৩)। *ফিল আদাবিল হাদীছ*, ১ম খণ্ড। ৮ম সং, দারুল ফিক্‌র, মিশর।

---------- (১৯৭৬)। *নাশ'আতুন নাছরিল হাদিছ ওয়া তাত্ত্বাওওরুহূ*। ৮ম সং, দারুল ফিক্‌র, মিশর।

উমার ফাররুখ (১৯৮৪)। *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি*, ১ম খণ্ড। ৫ম সং, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, বৈরুত।

জাওয়াদ 'আলি (১৯৭৮)। *আল-মুফাস্‌সাল ফি তারিখিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম*, ৯ম খণ্ড। ২য় সং, মাকতাবাতু আন-নাহদা, ইরাক।

জুরজি যায়দান (তা. বি.)। *তারিখু 'আদাবিল লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড। ড. শাওকি দ্বায়ফ সম্পা., দারুল হিলাল, মিশর।

ত্বাহা হুসায়ন (তা. বি.)। *হাদিছুল আরবি'আ* ২য় খণ্ড। ১১শ সং, দারুল মা'আরিফ, মিশর।

ত্বাহা আহমাদ ইব্রাহীম (১৯৮৫)। *তারীখুন নাক্‌দিল আদাবী 'ইনদাল 'আরাব*। ১ম সং, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

না'মাত আহমাদ ফুয়াদ (তা. বি.)। *খাসাইসুশ্ শি'রিল হাদিছ*। দারুল ফিক্‌র আল-'আরবি, মিশর।

বুতরুস আল-বুস্তানি (১৯৮৯)। *'উদাবাউল 'আরব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদরিল ইসলাম*। দারু নাযির 'আব্বূদ, বৈরুত।

---------- (১৯৮৯ক)। *'উদাবাউল 'আরব ফিল আ'সুরিল 'আব্বাসিয়্যাহ*, দারু নাযির 'আব্বুদ, বৈরুত।

--------- (১৯৮৯খ)। *'উদাবাউল 'আরব ফিল আনদালুস ওয়া 'আসরুল 'ইনবি'আছ*। দারু নাযির 'আব্বুদ, বৈরুত।

মুকতাদা হাসান আযহারী (১৯৮৫)। *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড। ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত ও সম্পা. মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, রাজশাহী।

মুসা আনসারী (১৯৯৯)। *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ (১৯৯২)। "আধুনিক আরবী কাব্যের বিকাশধারা", *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*। কলা অনুষদ, ৮ম খণ্ড, জুন ১৯৯২ চট্টগ্রাম। পৃ. ১৫৯-১৭৩

মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহি (২০০১)। *তাবাকাতুশ্-শু'আরা'*। দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

মুহাম্মদ আত্-তুনজি (১৯৯৯)। *আল-মু'জামুল মুফাস্সাল ফিল আদাব*, ২য় খণ্ড। ২য় সং, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

মোস্তফা সাদিক আর-রাফি'ঈ (২০০৩)। *তারিখু আদাবিল 'আরব*, ৩য় খণ্ড। ১ম সং, দারুল কিতাব আল-'আরবি, বৈরুত।

য়াহ্য়া আল-জাব্বুরি (২০০১)। *আশ-শি'রুল জাহিলী: খাসাইসুহূ ওয়া ফুনূনুহূ*। ৯ম সং, মু'আস্সাতু আর-রিসালাহ, বৈরুত।

রাবি' ইব্ন হাবিব (১৪১৫হি.)। *আল-জামি' আস-সাহিহ মুসনাদুল ইমাম রাবি' ইব্ন হাবিব*, ১ম খণ্ড। মুহাম্মাদ ইদ্রিস ও আ'শুর ইব্ন য়ুসুফ সম্পা., দারুল হিকমা, বৈরুত।

শাওকি দ্বায়ফ (তা. বি.)। *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি: আল-'আসরুল জাহিলি*। ২৪শ সং, দারুল মা'আরিফ, কায়রো।

---------- (তা. বি.ক)। *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি: আল-'আসরুল 'আব্বাসি আল-'আওয়াল*। ৬ষ্ঠ সং, দারুল মা'আরিফ, কায়রো।

---------- (তা. বি.খ)। *আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহূ ফিশ-শি'রিল 'আরাবি*। ১০ম সং, দারুল মা'আরিফ, কায়রো।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯৯৭)। *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। ২য় সং, ই. ফা. বা., ঢাকা।

হান্না আল-ফাখুরি (১৯৯১)। *আল-মূজায ফিল আদাবিল 'আরাবি ওয়া তারিখিহি*, ২য় খণ্ড। ২য় সং, দারুল জিল, বৈরুত।

---------- (তা. বি.)। *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি*। আল-মাতবা'আ আল-বুলিসিয়্যাহ, বৈরুত।

হাফেজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা ও আ.ক.ম. আবদুল কাদের (১৯৯২)। "আল-বারুদির কাব্যপ্রতিভা", *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*। কলা অনুষদ, ৮ম খণ্ড, জুন, ১৯৯২ চট্টগ্রাম। পৃ. ১২৭-১৩৬

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড (১৯৮৬), ১৬শ খণ্ড [১ম ভাগ] (১৯৯৫), ২৪শ খণ্ড [২য় ভাগ] (১৯৯৮)। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পা., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Hitti, Philip K. (1968). *History of The Arabs*. 9th ed, Macmillan, London.

Nicholson, R. A. (1966). *A Literary History of the Arabs*. Cambridge University press, Cambridge.